ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা : ৮
জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০১৯

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে নতুন ধারা

ইসলামী আন্দোলনের গণভিত্তি রচনায় শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা

বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা

দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা

শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে প্যারালিগ্যাল কর্মীর ভূমিকা

শ্রমিকদের আইনগত অধিকার আদায় ও করণীয়

বৃহত্তর ঢাকা বিভাগের বাছাইকৃত দায়িত্বশীলদের নিয়ে ২দিন ব্যাপী লিডারশীপ ট্রেনিং প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মজিবুর রহমান

বিভাগ ও মহানগরী সভাপতিদের বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ফেডারেশনের ওয়েব সাইটের নতুন সংস্করণ উদ্বোধন করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঢাকা মহানগরী উত্তর আয়োজিত রিকসা শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ করছেনফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের শ্রমিক প্রতিনিধি কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

খাগড়াছড়ি জেলার উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমেদ

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ০৮
জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০১৯

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সম্পাদক
আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
জাহাঙ্গীর আলম

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আবু তাশরিন

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর-২০১৯

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪
ডক্টর মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মাদানী

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে নতুন ধারা ৬
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ইসলামী আন্দোলনের গণভিত্তি রচনায় শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা ১২
এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ

বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা ১৮
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

কৃষি ও কৃষক ২০
গোলাম রব্বানী

দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা ২২
লস্কর মোহাম্মদ তসলিম

সড়ক দুর্ঘটনা ও ঈদযাত্রা ২৪
কবির আহমদ

শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে প্যারালিগ্যাল কর্মীর ভূমিকা ২৫
আতিকুর রহমান

পরিবহন শ্রমিকদের যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত ২৮
খান মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী

শ্রমিকদের আইনগত অধিকার আদায় ও করণীয় ২৯
এ্যাডভোকেট এস.এম আলমগীর

মসলা কাণ্ড! ৩২
এডভোকেট আলমগীর হোসাইন

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) এবং বাংলাদেশ ৩৪
আবুল হাশেম

পারিবারিক বন্ধন: সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণশক্তি ৩৫
মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ আদিল

রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন সময়ের অনিবার্য দাবি ৩৭
আবু সাঈদ

দর্জি-শ্রমিক ৩৯
অধ্যাপক আব্দুল মতিন

তাঁত শিল্প ৪১

সকল ধর্মেই সুদ নিষিদ্ধ ৪২
মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

ডেঙ্গু হলে আতঙ্ক নয় হাতের কাছেই আছে প্রতিরোধের সহজ উপায় ৪৫

ফেডারেশন সংবাদ ৪৬

সম্পাদকীয়

সম্ভাবনার বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক রকম স্বপ্ন দেখি; অনেক স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে নানা পরিকল্পনার ছক এঁকে যাই নিয়মিত। দেশটি এখন মধ্য-আয়ের দেশ, মেগা উন্নয়নের দেশ, বিশ্বের সর্বোচ্চ খরচের হাইওয়ে আর ফ্লাইওভারের দেশ, দ্রুত বর্ধনশীল ধনীদের দেশ। এদেশে প্রতি বছর টাকার দাম কমে যায় আর চাল-ডাল-আটা-চিনির দাম বেড়ে যায়। তুলনামূলকভাবে বাড়ে না মজুর শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের বেতন। রাজধানী ও বড় শহরের জীবনযাত্রার ব্যয় যেখানে প্রায় নিউ ইয়র্কের মধ্যবিত্তের সমান, সেখানে শ্রমিকেরা পায় নিম্নমানের মজুরি। এ বছরের শুরুতে আন্দোলনকারী নাছোড়-শ্রমিকেরা পেয়েছিলেন একজন সুমনের গুলিবিদ্ধ লাশ। একরাশ হতাশা আর বেদনাভরা কয়েক বুক কষ্ট। একটা সময় আন্দোলন করে কাজ হতো এখন আমরা সেই দিক থেকেও বলা চলে হতাশ। আন্দোলন হলেই মালিকপক্ষ সরকারের মন্ত্রীদের মতো করে বলে ওঠেন, "দেশকে অস্থিতিশীল করতে শ্রমিকদের উসকানো হচ্ছে।" কিন্তু উসকানি যে বঞ্চনা থেকে আসে এ কথা যারা বুঝলে কাজ হবে তারা বুঝতে চান না। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় দেশকে উন্নয়নের দুর্বার গতিতে পরিচালিত করতে নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কল-কারখানা ও গার্মেন্টস মালিকদের জন্য সরকার থেকে অনেক সুবিধা দেয়া হয়েছে। তবে কি সরকারি ঋণসুবিধা, এলসি-সুবিধা, করসুবিধার পরও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দিতে কার্পণ্য করেন মালিকরা? মালিকদের আচরণ ও বাস্তবতায় এই চিত্রই তো দেখছি আমরা।

এ বছর ধানচাষিদের করুণ চিত্র লক্ষ্য করেছে বাংলাদেশের আপামর জনতা। বাজারে চালের দাম বেশি অথচ ধানের দাম একেবারেই কম। ধান চাষ করে প্রতি বিঘায় চাষিদের দুই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা লোকসান গুনতে হয়। আগের মৌসুমে ধানের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে কৃষকরা অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। মনের ক্ষোভে অনেকে পাকা ধানের ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন; রাস্তায় ধান ছিটিয়েও প্রতিবাদ করেছেন অনেকে। ঈদ উপলক্ষে ছেলেমেয়ের নানা চাহিদা আর সংসারের অভাব নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে পাবনার ভাঙ্গুরা উপজেলায় সেলিম হোসেন (৪৫) নামের এক কৃষক গত ২১ মে আত্মহত্যা করেছেন। বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, দেশে কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৫১ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৩। আর দেশের শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেকই কৃষক। কৃষি অর্থনীতিবিদগণ কৃষকদের এই দুরবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলানোর কারিগর কৃষকদের এ অবস্থা চলতে থাকলে সোনালি আঁশ পাট বা আখের মতো একদিন ধানও হারিয়ে যাবে বাংলাদেশের কৃষি থেকে। সোনার বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে ধানের উৎপাদন ধরে রাখতে হবে; কৃষকদের বাঁচাতে হবে এবং ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকারকে এবার আগাম সৎ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে আর যেকোনো মূল্যে দাদা বাবুদের চাল আমদানি বন্ধ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯৩০ সালের তেভাগা আন্দোলনের কথা। বাংলার কয়েকটি জেলায় কৃষকরা তেভাগার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। যার মূল দাবি ছিল, ভাগচাষিকে ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দিতে হবে। এই আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণ বর্ণবাদী হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান ও নমঃশূদ্র চাষিদের অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলনে জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজদের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করতে হয়েছিল কৃষকদের। সুতরাং বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য বুকে লালন করতে হলে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকার ও কারখানা মালিক পক্ষকে অনেক বেশি উদার হতে হবে।

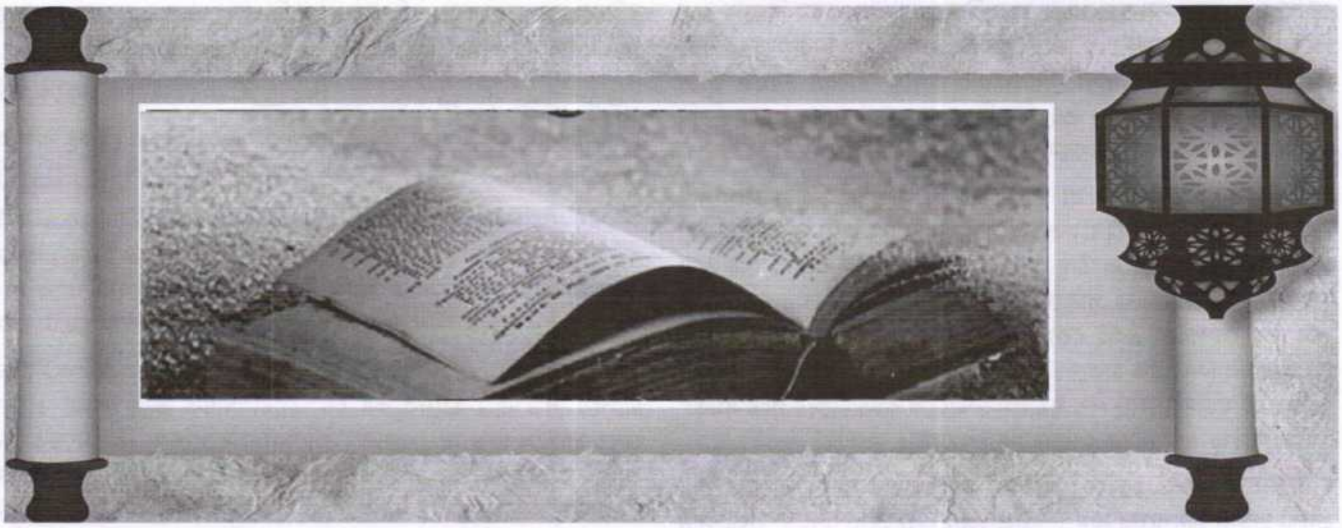

অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ডক্টর মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মাদানী

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَب عَنْ الْمَعْرُور بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ) رواه البخاري

সরল অনুবাদ: বিশিষ্ট সাহাবী মা'রু ইবনে সুয়াইদ (রা) বলেন, আমি (সাহাবী) আবু যার গিফারীর (রা) সাথে 'রাবাযা' নামক স্থানে সাক্ষাৎ করলাম। দেখলাম তার গায়ে একটি দামি বিদেশী পোশাক এবং তারই চাকরের (খাদেম) গায়েও একই ধরনের পোশাক পরা। তখন আমি (সাহাবী) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম! জবাবে আবু যার গিফারী (রা) বলেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে (চাকর) বকাঝকা ও গালিগালাজ করছিলাম। এক পর্যায়ে তার মায়ের নাম ধরে গালি দিলাম। এ কথা শুনে রাসূল (সা) আমাকে বললেন, হে আবু যার, তুমি তার মায়ের নাম ধরে গালি দিলে! (তুমি মুসলিম হওয়ার পরও) নিশ্চয়ই তোমার মাঝে জাহেলি বা অন্ধকার যুগের চরিত্র রয়ে গেছে। তারা তোমাদের সম্পর্কিত ভাই (বিভিন্ন সম্পর্কের ভাই)। কর্মচারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যদি কারোর ভাই (যে কোনো সম্পর্কের ভাই) তার অধীনে কর্মচারী হয় তাহলে তিনি যা খাবেন কর্মচারীকে তাই খাওয়াবেন। তিনি যা পরবেন, কর্মচারীকে তাই পরাবেন। তাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব বা কাজ দিও না। আর যদি অতিরিক্ত দায়িত্ব দিতেই হয় তাহলে তাদেরকে সাহায্য কর। (সহীহ বুখারী ১/৫২)

হাদীসখানার সনদ যাচাই: আলোচ্য হাদীসখানা সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফসহ বিভিন্ন সহীহ হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে বিধায় হাদীসখানা সন্দেহাতীতভাবে সহীহ। উল্লেখ্য যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিম ব্যতিরেকে যেকোনো হাদীস গ্রন্থের হাদীসের সনদের মান যাচাই করা একান্ত জরুরি। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে একটিও জাল বা জয়িফ হাদীস নেই বলে সকল উলামায়ে কেরাম একমত। কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফেরকা, মাজহাব, বক্তা, দরবারি আলিম, কবি সাহিত্যিকগণ তাদের সুবিধামতো জাল বা বানোয়াট হাদীস বানিয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আবু ইসমাহ ইবনে আবি মারইয়াম একাই চার হাজার জাল হাদীস বর্ণনা করেন। (তাদবিনুস্সুন্নাহ ১/১৮৭)

রাবী পরিচিতি : বিশিষ্ট সাহাবী আবু যার গিফারীর নাম জুনদুব ইবনে জুমাদা আল গিফারী। তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। বলা হয় তিনি চতুর্থ নম্বর ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী। তিনিই মদীনা হিজরতের পর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দিন কাটাতেন। নবীর খেদমতের পর বাকি সময়টুকু তিনি মসজিদে নববীতে ঘুমিয়ে কাটাতেন। তিনি দুইশত একাশিটি হাদীস বর্ণনা করেন। আরবে বনি গিফার গোত্রের প্রভাবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। যাকাতের আয়াত নাযিল হওয়ার পরপরই তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সম্পদ দান করে সাদামাঠা জীবন-যাপন শুরু করেন। হযরত ওসমান (রা) এর খেলাফতের সময়ে তিনি ধনীদের পুঞ্জীভূত সম্পদ রাষ্ট্রীয়

কোষাগারে নিয়ে সকলের মাঝে সমবণ্টনের ব্যাপারে চরম বিদ্রোহ শুরু করেন। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার স্বার্থে উসমান (রা) তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারার অদূরে 'রাবাযা' নামক স্থানে তাঁকে পুনর্বাসিত করেন। ৩২ হিজরিতে 'রাবাযা' নামক গ্রামে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট বা শানে অরুদ: সাহাবী আবু যার গিফারী (রা) কে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক 'রাবাযা' নামক স্থানে পুনর্বাসিত করা হলে খলিফার পক্ষ থেকে তাঁর সর্বশেষ অবস্থার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য সাহাবী সুয়াইদ (রা)কে পাঠানো হয়েছিল। তিনি আবু যার (রা) এবং তার চাকরের পরনে একই রকম পোশাক দেখে আবু যার (রা) এর কাছ থেকে রাসূল (সা) এক চাকরের গালি দেওয়ার ঘটনা জানতে পারেন। সে প্রেক্ষিতেই মহানবী (সা) বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে কর্মচারীদের প্রতি সমতা, উদার, সহিষ্ণু ও মানবিক হওয়ার নির্দেশ দেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা : بِالرَّبَذَةِ মদীনার মুনাওয়ারার অদূরে 'রাবাযা' পল্লী একটি প্রসিদ্ধ জনপদের নাম। وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ তৎকালীন যুগের সবচেয়ে দামি পোশাকের নাম ছিল 'হুল্লাহ', যা সাহাবী আবু যার গিফারী নিজেও পরেছিলেন তার চাকরকেও একই পোশাক পরিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا (الزخرف الآية:

"আমি দুনিয়াতে তাদের জীবনযাত্রার মান বণ্টন করে দিয়েছি...(সূরা যুখরুফ: ৩২) سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ

আমি আমার এক চাকরকে গালি দিতে দিতে তার মাকে পর্যন্ত অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেছিলাম। এখানে মৌলিক তিনটি অপরাধ হয়ে গেল। ১. অপর ভাইকে গালি দেয়া ২. অপর ভাইকে তাচ্ছিল্য করা ৩. তার মাকে টেনে আনা। إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ নিশ্চয় তোমার মাঝে জাহেলি কু-অভ্যাস রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তুমি প্রথম যুগের প্রথম স্তরের মুসলিম হওয়ার পরও জাহেলি যুগের অন্ধকার সমাজের কু-অভ্যাস তোমার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ তারা তোমাদের বিভিন্ন সম্পর্কে ভাই। অর্থাৎ অধীনস্থ কর্মচারী, চাকর, দাস-দাসী সবাই যেকোনো দিক থেকে, যেকোনো সম্পর্কের ভাই। কারণ সকলেরই প্রথম পিতা-মাতা আদম-হাওয়া (আ)। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সা) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে শ্রমিকের হাতে চুমু খেতেন। তিনি আনসারির হাতে চুমু খেয়ে বললেন, "এই হাতে কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।" (মুসলিম, হাদীস নং-১৫৬৭) তিনি বলেছেন, দুনিয়াতে আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি বকরি চরাননি। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আপনিও কি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও এক 'কিরাত' (সামান্য অর্থ) দু'কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীর বকরি চরিয়েছি। (ফাতহুল বারী, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৩০৯) শ্রমের মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ–

কারো জন্য স্বহস্তের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার্য আর নেই। আর আল্লাহর নবী দাউদ (আ) স্বহস্তে জীবিকা নির্বাহ করতেন। (বুখারী, মিশকাত হা-২৭৫৯) রাসূল (সা) বলেছেন, শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করবে না। (বুখারী ২/১৩২, বায়হাকি)। جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে দুনিয়ায় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে মুখাপেক্ষী। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মুখাপেক্ষীহীন। *একজন শ্রমিকের সবচেয়ে বড় অধিকার বা দাবি হলো, তার শ্রমের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করা। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেন,

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ– তোমরা শ্রমিককে তার শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৯৮৭)* فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ

অতএব তোমরা যা খাবে তোমার অধীনস্থ কর্মচারীদেরকেও তাই খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরতে দিবে। অর্থাৎ তারা কর্মচারী বলে নোংরা বাসি নিম্নমানের খাবার দেয়া যাবে না। আবার একেবারেই নিম্নমানের পোশাক দিয়ে তাদেরকে ছোট করে দেখা যাবে না। وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ তাদের অস্বাভাবিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিও না। তাদের কষ্ট হয় অথবা অধিক ভারী বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিও না। রাসূল (সা) আরো বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ উত্থাপন করবেন। তন্মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, যে ব্যক্তি কাউকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করে, তার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা সত্ত্বেও তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করে না। (বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড: ১৩২)। তিনি আরো বলেছেন, চাকর, দাস-দাসী ও অধীনস্থদের সঙ্গে অসদাচরণকারী বেহেশতে যেতে পারবে না। (তিরমিজি : ২৯৯৮) ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি/ মানুষকে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।' (কাজী নজরুল ইসলাম) فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ। আর যদি তাদেরকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দাও তাহলে তাদেরকে সহযোগিতা কর। অর্থাৎ নির্ধারিত দায়িত্বের উপরে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিলে তার সাথে তোমরা নিজেরা অথবা অন্য লোক দিয়ে সহযোগিতা কর। অথবা তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের কারণে তাদেরকে ওভারটাইম বা বোনাস ভাতা বাড়িয়ে দাও।

মৌলিক শিক্ষা:

১. নিকটতম ও দূরতম সকলের খোঁজ-খবর নেয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

২. সরকারের পক্ষ থেকে পুনর্বাসিতদের পূর্ণ খোঁজখবর রাখতে হবে।

৩. কাউকে গালি দেয়া যাবে না, ছোট করা যাবে না, হেয় করা যাবে না। ৪. বাবা-মা ইত্যাদির নাম ধরে গালি দেয়া চিরতরে হারাম।

৫. কাউকে গালি দেয়া অনৈসলামিক ও মূর্খতা যুগের কাজ।

৬. কর্মচারী, চাকর-বাকর, দাস-দাসীদের প্রতি সদয় ও মানবিক হতে হবে। তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিশেষ সজাগ থাকতে হবে।

৭. তাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া যাবে না। যদি অতিরিক্ত দায়িত্ব বা কাজ দেয়া হয় তাহলে তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে।

আহ্বান: আসুন আমাদের শ্রমিক শ্রেণী, চাকর-চাকরানী, দাস-দাসী ও সকল স্তরের কর্মচারীদের প্রতি সদয়, মানবিক ও দরদি হই। যাদের পরিশ্রমের বদৌলতে মালিক শ্রেণীর সমস্ত আনন্দ-ফূর্তি ও বিলাসিতার চাকা ঘোরে তাদেরকে বঞ্চিত করা আদৌ ঠিক নয়। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমিন।

লেখক : বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক ও মিডিয়া-ব্যক্তিত্ব

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে নতুন ধারা

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

কলকারখানা তথা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি তথা তার বাঁচার অধিকারের দাবিকে যুগে যুগে একশ্রেণীর সুবিধাভোগী নেতারা আন্দোলনের মুখরোচক শ্লোগান ও ইস্যু হিসেবে যতটা ব্যবহার করেছেন এবং এসব ইস্যুকে তাদের হীন স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন, সেই তুলনায় অবহেলিত অনাহারী শ্রমিকের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে খুবই কম। এমনকি উৎপাদনশীলতা এবং জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ তথা দেশ ও জাতিগঠনে এসব ইস্যু, আন্দোলন ও নেতৃত্ব ইতিবাচক প্রভাবের চেয়ে বরং নেতিবাচক প্রভাবই বেশি তৈরি করেছে।

শ্রমিক শ্রেণী, শ্রমিক রাজ, শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক রাজনীতি, শ্রমনীতি, শ্রমজীবী, শ্রম-আইন, শ্রম-দফতর, শ্রম-মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), মে দিবস, দুনিয়ার মজদুর, শ্রেণী সংগ্রাম, CBA, বেসিক ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন, দফা, দাবি, অধিকার, সংগ্রাম, ধর্মঘট ইত্যাদি শব্দমালা একজন শ্রমিক বা শ্রমিক নেতার কাছে বহুল পরিচিত। সভ্যতার ঘূর্ণায়মান চাকার সাথে তাল মিলিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে দুঃখী, বঞ্চিত, অবহেলিত শ্রমিক সমাজের প্রকৃত অধিকার ও মুক্তির লড়াইয়ে বিশ্বব্যাপী এসব বিষয়ের চর্চার ব্যাপকতা পেতে শুরু করে। কলকারখানা তথা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি তথা তার বাঁচার অধিকারের দাবিকে যুগে যুগে একশ্রেণীর সুবিধাভোগী নেতারা আন্দোলনের মুখরোচক শ্লোগান ও ইস্যু হিসেবে যতটা ব্যবহার করেছেন এবং এসব ইস্যুকে তাদের হীন স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন, সেই তুলনায় অবহেলিত অনাহারী শ্রমিকের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে খুবই কম। এমনকি উৎপাদনশীলতা এবং জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ তথা দেশ ও জাতিগঠনে এসব ইস্যু, আন্দোলন ও নেতৃত্ব ইতিবাচক প্রভাবের চেয়ে বরং নেতিবাচক প্রভাবই বেশি তৈরি করেছে। কারণ কালে কালে শ্রমিক আন্দোলনের এ প্রচলিত ধারায় যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি, হীন ব্যক্তিস্বার্থ, হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, অর্থলোলুপতা, শ্রমিক স্বার্থবিনাশী দালালচক্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি। এর সাথে রয়েছে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সেবাদাস কিছু সংস্থা-সংগঠনের সর্বনাশা শোষণের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। ষাটের দশক থেকে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের গান শুনিয়ে, লাল পতাকা আর শ্রেণী সংগ্রামের ধুয়া তুলে মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্বের হিংসাত্মক বীজ ছড়িয়ে এক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক নেতারা শ্রমিকরাজের স্বপ্নে শ্রমিকদের বিভোর রেখে নিজেরা ক্ষমতার সিঁড়িতে উঠেছে। লুটপাট

করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে। কিন্তু আজও ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের মিছিল থামেনি। এদিকে ট্রেড-ইউনিয়নকে যেসব নেতারা School of Commiunism বানাতে চেয়েছিলেন, তারা সমাজতন্ত্রের জন্মভূমিতেই সমাজতন্ত্রের আত্মহত্যার করুণ দৃশ্য দেখে বোল পাল্টিয়ে নব্য পুঁজিবাদী কৌশলে শ্রমিক মালিকের জন্য প্রতারণার নতুন নতুন ফাঁদ আবিষ্কারে এখন মত্ত হয়েছেন। মজলুম শ্রমজীবী মানুষের তথা দেশ, জাতি ও অর্থনীতির কল্যাণে চিন্তাবিমুখ শ্রমিক আন্দোলনের এই প্রচলিত সর্বগ্রাসী নেতিবাচক ধারার পরিবর্তে সময়ের দাবি পূরণে আজ প্রয়োজন শ্রমিক আন্দোলনের এক নতুন ধারার। যে ধারা শ্রমিক- মালিক ভ্রাতৃত্ব তৈরি করে উৎপাদনের চাকা সচল রেখে মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে একটি সুস্থ গঠনমূলক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে। একটি শোষণমুক্ত সুবিচারপূর্ণ সমাজগঠনের লক্ষ্যে শ্রমিক-জনতার নেতৃত্বে আন্দোলনের সেই নতুন ধারা পৌছাবে মানবতার প্রকৃত মুক্তির মোহনায়। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডরেশন শ্রমিক আন্দোলনের সেই নতুন ধারা। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, নেতৃত্ব, কর্মীগঠন, কর্মসূচি, ট্রেড ইউনিয়ন ও নৈতিক মানের সকল ক্ষেত্রে নবতর এক ধারার সৃষ্টি করে শিল্প অর্থনীতির বিকাশ ও জাতিগঠনে এ ফেডারেশন ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশবাসী ও মুক্তিকামী শ্রমিক জনতাকে শ্রমিক আন্দোলনের সে নতুন ধারায় সম্পৃক্ত করা এখন সময়ের দাবি। 'বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে নতুনা ধারা' নামক এ নিবন্ধ সে লক্ষ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে: প্রচলিত শ্রমিক আন্দোলনের নেই কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। কেউ শ্রমিকরাজ কায়েমের মুখরোচক শ্লোগানের আড়ালে সমাজতন্ত্রের নাস্তিক্যবাদী মতবাদ কায়েমের উদ্দেশ্যে কাজ করছে। তাদের দর্শন "Trade union is the school of communism." শ্রেণী সংগ্রামই পৃথিবীর ইতিহাস। লেনিনের লিখিত Religion বইতে ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে Long live athism. Down with religion. অর্থাৎ "নাস্তিক্যবাদ দীর্ঘজীবী হোক, ধর্ম ধ্বংস হোক"। তারা শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলে মালিক-শ্রমিক সংঘাতের বীজ বপন করে নৈরাজ্যের মাধ্যমে মুক্তিকামী শ্রমিকসমাজকে মূলত ট্রেড ইউনিয়নের আড়ালে সমাজতন্ত্রের দীক্ষা দিতে চায়। তারা পদে পদে ব্যর্থ হয়ে যুগে যুগে ক্ষমতা ও পুঁজির দালালে পরিণত হয়েছে। কেউ আবার পশ্চিমা পুজিবাদের স্বার্থ রক্ষায় শ্রমিকদের শোষণ করে পুঁজির পাহাড় গড়ে নানান এনজিও সংস্থা ও সংগঠন তৈরির মাধ্যমে বঞ্চিত শ্রমিকদেরকে শোষণের জালে আটকাতে কাজ করছে। নূনতম জীবনধারণের প্রয়োজনটুকুও পূরণ না করে

"

কেউ আবার পশ্চিমা পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষায় শ্রমিকদের শোষণ করে পুঁজির পাহাড় গড়ে নানান এনজিও সংস্থা ও সংগঠন তৈরির মাধ্যমে বঞ্চিত শ্রমিকদেরকে শোষণের জালে আটকাতে কাজ করছে। ন্যূনতম জীবনধারণের প্রয়োজনটুকুও পূরণ না করে অসহায় শ্রমিকের রক্ত, ঘাম, হাড়-মাংস শোষণ করে একশ্রেণীর পুঁজিপতি সৃষ্টি করা এই ধারার কাজ। কেউ আবার সব সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য শ্রমিকসমাজকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে হীন রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থে ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করতে ভাড়াটিয়ার মত মেহনতি শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করে।

"

অসহায় শ্রমিকের রক্ত, ঘাম, হাড়-মাংস শোষণ করে একশ্রেণীর পুঁজিপতি সৃষ্টি করা এই ধারার কাজ। কেউ আবার সব সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য শ্রমিকসমাজকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে হীন রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থে ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করতে ভাড়াটিয়ার মত মেহনতি শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করে। কলকারখানায় ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বত্র চলে তাদের লুণ্ঠন ও চাঁদাবাজি। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দমন পীড়ন, মামলা হামলা চালিয়ে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে দুঃখী শ্রমিকদেরকে তারা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। স্বার্থ হাসিল হয়ে গেলে এক সময় ব্যবহৃত টয়লেট পেপারের মত শ্রমিকদেরকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়। শ্রমিকসমাজ তাদের দুঃখ বঞ্চনা নিয়ে কষ্টের তিমিরেই পড়ে থাকে যুগ যুগ ধরে। তাই এ সত্য আজ সর্বজনবিদিত যে, বর্তমান প্রচলিত শ্রমিক আন্দোলন দেশ-জাতির তথা শ্রমিকের কল্যাণ বিবেচনায় দিক নির্দেশনাহীন, গণতন্ত্রহীন, উদ্দেশ্যহীন ও অপরিণামদর্শী এক সর্বনাশা পথে চলেছে। আসলে সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও কায়েমি স্বার্থের ধ্বংস জোয়ারে দিকভ্রান্ত শ্রমিকসমাজের কাছে আজ এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, শ্রেণী সংগ্রাম নয় সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বই পৃথিবীর ইতিহাস। ট্রেড ইউনিয়ন School of Communism নয়, বরং School of Justice, শ্রমিকরাজের নামে মানবরচিত কোনো মতবদ নয় বরং মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের রাজ। যা ইসলাম নামক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং মানবমুক্তির একমাত্র ও শাশ্বত পথ। মহানবী (সা)-এর অনুপম আদর্শের আলোকে প্রণীত শ্রমনীতিই শ্রমিকসমাজের প্রকৃত অধিকার ও মুক্তির গ্যারান্টি। যে সমাজতন্ত্র ধর্মের ধ্বংস কামনা করে, নাস্তিকতার দীর্ঘ জীবন কামনা করে, ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করে (Religion is the opium for the people)| সেই নাস্তিকতাবাদী শ্রমনীতি নয় বরং বিশ্বজাহানের একমাত্র অধিকর্তা মহান আল্লাহর বিধান পবিত্র কুরআন মজিদ ও মহানবীর জীবনাদর্শের মধ্যেই শ্রমিকসমাজের প্রকৃত মুক্তি নিহিত। এই কালজয়ী আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলনই নতুন ধারা। শ্রমিক আন্দোলনের এ নতুন ধারায় মহানবীর (সা) আদর্শই চূড়ান্ত লক্ষ্য। এখানে শ্রমিকেরও মৌলিক অধিকার তাই হবে, যা খাওয়া পরার ক্ষেত্রে মালিকের অধিকার। ঘাম শুকানোর আগে মজুরি দিতে হবে। শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব নয় ভ্রাতৃত্ব। হঠকারিতা ও ধ্বংস নয়,

নিয়মতান্ত্রিকতা ও উৎপাদনশীলতা। অরাজকতা নয় দায়িত্বশীলতা। মালিকের লভ্যাংশে শ্রমিকের অংশীদারিত্ব। সাধ্যের অতিরিক্ত শ্রম নয় বরং শ্রমিকের অক্ষমতায় সাহায্য কর। অতিরিক্ত শ্রমের জন্য অতিরিক্ত মজুরি দাও। চাকরি শেষে পোষ্যদের জন্য ভাতা দাও। মানুষ মানুষে ভেদাভেদ নয়। চরিত্র ও নৈতিকতাই মর্যাদার মানদণ্ড। জুলুম নয় সুবিচারই ট্রেড ইউনিয়নের মূলমন্ত্র। হালাল রুজিই উত্তম রুজি। এ দুনিয়াই শেষ নয় আখেরাতের জবাবদিহিতাই আসল। মোদ্দাকথায় এসব মৌলিক নীতিকে ধারণ করে একটি ইনসাফপূর্ণ কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের যে ধারা, সেটাই বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে নতুন ধারা। লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তাই প্রচলিত ধারা থেকে এই নতুন ধারার রয়েছে অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা এ দেশের মেহনতি মুক্তিকামী শ্রমিকসমাজকে আলোড়িত করেছে। কলকারখানায় ও সকল পেশার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ভাই-বোন আন্দোলনের এ নতুন ধারায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সেই নতুন ধারার নেতৃত্ব দিচ্ছে। লক্ষ উদ্দেশ্যের পবিত্রতা, গঠনমূলক কর্মসূচি, নৈতিকতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব এই কাফেলাকে দিয়েছে একটি প্রাণবন্ত শক্তি ও গতিময়তা।

নেতৃত্ব তৈরি: নতুন ধারার নেতৃত্ব তৈরিতে সাংগঠনিক ও ট্রেড ইউনিয়ন যোগ্যতার পাশাপাশি নৈতিক মানের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। কারণ প্রচলিত নেতৃত্বের ধারণায় কেবলমাত্র গলাবাজি, দালালি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি ও দখলদারির মতো অনৈতিকতার প্রাধান্য বিরাজমান। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মিথ্যাচার, দুর্নীতি ও বলপ্রয়োগ বর্তমান নেতৃত্বের একটা বড় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত। এদের কাছে সততা ও নৈতিকতার কোনো মূল্য নেই। পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিকতর সম্মানিত যে অধিক আল্লাহকে ভয় করে।" এটাই নেতৃত্বের ইসলামী ধারণা। যার অন্তরে নিজ দায় দায়িত্বের ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় সর্বদা বিদ্যমান, সেই শুধু দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতায় নিষ্ঠাবান থাকবে, এটাই বাস্তবতা। এই নৈতিক মানকে প্রাধান্য দিয়ে তারপর আদর্শিক জ্ঞান ও ট্রেড ইউনিয়নের জ্ঞান অর্জন এই ধারার বৈশিষ্ট্য। সংগঠন ও আন্দোলন পরিচালনায় সমকালীন চাহিদা পূরণ করে কাজ করার মত যোগ্যতা, জ্ঞানের অনুশীলন ও চর্চার জন্য সংগঠনে নিয়মিত ওয়ার্কশপ ও

> **শ্রমিক আন্দোলনের এ নতুন ধারায় মহানবীর (সা) আদর্শই চূড়ান্ত লক্ষ্য। এখানে শ্রমিকেরও মৌলিক অধিকার তাই হবে, যা খাওয়া পরার ক্ষেত্রে মালিকের অধিকার। ঘাম শুকানোর আগে মজুরি দিতে হবে। শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব নয় ভ্রাতৃত্ব। হঠকারিতা ও ধ্বংস নয়, নিয়মতান্ত্রিকতা ও উৎপাদনশীলতা। অরাজকতা নয় দায়িত্বশীলতা। মালিকের লভ্যাংশে শ্রমিকের অংশীদারিত্ব। সাধ্যের অতিরিক্ত শ্রম নয় বরং শ্রমিকের অক্ষমতায় সাহায্য কর। অতিরিক্ত শ্রমের জন্য অতিরিক্ত মজুরি দাও। চাকরি শেষে পোষ্যদের জন্য ভাতা দাও। মানুষ মানুষে ভেদাভেদ নয়। চরিত্র ও নৈতিকতাই মর্যাদার মানদণ্ড। জুলুম নয় সুবিচারই ট্রেড ইউনিয়নের মূলমন্ত্র।**

সিলেবাসভিত্তিক অধ্যয়ন নতুন ধারার নেতৃত্ব তৈরির নিয়মিত কর্মসূচি। যা শ্রমিক আন্দোলনের প্রচলিত ধারায় অনুপস্থিত। ফলে অদক্ষ ও অনৈতিক নেতৃত্বের কারণে শ্রমিক আন্দোলন তার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রচলিত ধারার ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দখলের জন্য পদলোভ, হানাহানি, হত্যাকাণ্ড, কালো টাকার খেলা, জবরদখল, অনিয়মতান্ত্রিকতা, গ্রুপিং ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলে। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ধারায় নেতৃত্ব তৈরিতে ব্যক্তির পদের লোভ বা পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। এখানে গঠনতান্ত্রিক নির্ধারিত ফোরামের মাধ্যমে মেয়াদান্তে নিয়ম মোতাবেক নেতা নির্বাচন করা হয়। কোন পক্ষ বিপক্ষ ছাড়াই একটি শান্তিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে নির্বাচিত নেতৃত্ব সকলের আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য হয় এবং কেবলমাত্র সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে নিবেদিত হয়ে কাজ করে। সঙ্গী সাথীদের সহযোগিতা ও শুভকামনা থাকে তার সাথে। পারস্পরিক সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা এবং পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি এখানে যথাযথভাবে পালিত হয়। ফলে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ধারার এ নেতৃত্ব গতিশীল, সাহসী ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। সর্বোপরি মহান আল্লাহর রহমত সে নেতৃত্বের প্রতি বর্ষিত হয়। নেতৃত্বকে সংগঠনের নির্দিষ্ট ফোরামে তার কাজের জন্য যেমন জবাবদিহিতার মুখোমখি হতে হয়, তেমনি আখেরাতে মহান আল্লাহার কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতিও তাকে লালন করতে হয়। প্রচলিত বাতিল ধারায় এমন সুগঠিত পরিচ্ছন্ন নেতৃত্ব কিভাবে তৈরি হবে? সুতরাং আখেরাতের ভয়, জ্ঞানগত ও নৈতিকমান এবং গঠনতান্ত্রিক জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতার মাধ্যমেই শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ধারার নেতৃত্ব-প্রচলিত ধারার নেতৃত্বের চেয়ে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এমন নেতৃত্বের মাধ্যমেই মুক্তিকামী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে তার কাঙ্ক্ষিত মনজিলে পৌছানো সম্ভব। যা প্রচলিত ধারার শ্রমিক নেতৃত্বে সম্ভব নয়। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন তার অনন্য উদাহরণ।

কর্মী গঠন: নতুন ধারার আন্দোলন যেহেতু একটি আদর্শিক আন্দোলন, সেহেতু সেই আদর্শেরই মৌলিক জ্ঞান অর্জন একজন কর্মীর জন্য অপরিহার্য। তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের বুনিয়াদি জ্ঞান কর্মীর বিশ্বাসের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে থাকে। কর্মীকে

> জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার কমিশনের ঘোষণাপত্র ২৩-২৫, বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ১৪, ১৫, আইএলও কনভেনশন ৮৭-৯৮ এবং বাংলাদেশের সংশোধিত শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১৭৫-২০৮ মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সুরক্ষিত করা হলেও কার্যত ভুল নেতৃত্বের হীনস্বার্থে সেসব অধিকার অনেকাংশে খর্ব হচ্ছে। ফলে এ সব আইন বিধানের সুফল শ্রমিকের ঘরে যচ্ছে না।

পবিত্র কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যাসহ অধ্যয়ন , হাদিসের জ্ঞান এবং ইসলামী সাহিত্য, অন্যান্য মতাদর্শের জ্ঞান, সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান, শিল্প ও শ্রম আইন সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতে হয়। অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে সিলেবাসভিত্তিক অধ্যয়ন, চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নতুন ধারার কর্মীগঠন এ আন্দোলনের একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। অবশ্য কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে তার আত্মগঠন প্রক্রিয়াও ভিন্নতর হয়। সংগঠন পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্মীদের নিয়মিত মাসিক চাঁদা-ইউনিয়ন চাঁদা পরিশোধ করা ব্যধ্যতামূলক। সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে আদর্শের দাওয়াত প্রদান করে কর্মীকে সংগঠন সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখতে হয়। শ্রমিক সমস্যা, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপদে আপদে সেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো একজন কর্মীর নৈতিক কর্তব্য। আল্লাহর বিধানের অনুসরণ, নৈতিক চরিত্রগঠন, নিজের মানের ক্রমাগত উন্নয়নের প্রচেষ্টায় একজন কর্মীকে সারাক্ষণ তৎপর থাকতে হয়। নতুন সমর্থক-কর্মী তৈরি, সংগঠনের ইউনিট গড়ে তোলা, নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা পালন, নিয়মিত, সাপ্তাহিক ও মাসিক বৈঠকাদিতে অংশগ্রহণ করে আন্দোলনের সকল কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে একজন আদর্শ কর্মী গড়ে ওঠে। সংগঠনের নির্দিষ্ট ফোরামে প্রত্যেক কর্মীর ব্যক্তিগত কাজের রিপোর্ট, তার উপর অর্পিত সাংগঠনিক দায়িত্বের রিপোর্ট নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে একজন কর্মীকে প্রদান করতে হয়। এভাবে একজন দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহর পথে একটি সুবিচারপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আন্দোলনের সাথে একজন কর্মী নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। এক পর্যায়ে আন্দোলনের লক্ষ্য এবং তার জীবনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন রূপ লাভ করে। এভাবে পরীক্ষিত নেতা হিসেবে একজন শ্রমিককর্মীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। শ্রমিক আন্দোলনের এ নতুন ধারায় একজন কর্মীকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি, বাধা বিপত্তি, ত্যাগ-তিতিক্ষা, জুলুম নির্যাতনের কন্টকাকীর্ণ পথের মুখোমুখি হতে হয়। জীবনের মহৎ লক্ষপানে তার এ দুর্নিবার যাত্রায় সব কষ্ট-বাধা সে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করে এগিয়ে যায়। এভাবে তার মধ্যে নেতৃত্বের অসাধারণ সব গুণাবলি ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটে। যা শুধু পুঁথিগত লেখা পড়া বা বৈঠকি জ্ঞানে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ময়দানের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে করতে এক বিশেষ যোগ্যতা তৈরি হয়। এটাকে বলা হয় কর্মীগঠনের নেতিবাচক (Negative) পদ্ধতি। আর পড়াশুনা, বৈঠক ও আত্মগঠন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট গুণ ও যোগ্যতা তৈরির তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে বলে কর্মীগঠনের ইতিবাচক (positive) পদ্ধতি। তাই নেতিবাচক ও ইতিবাচক পদ্ধতির সব মিলিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের এ নতুন ধারায় রয়েছে যোগ্য কর্মী গঠনের অন্তর্নিহিত এক স্বয়ংক্রিয় চলমান প্রক্রিয়া। যা প্রচলিত শ্রমিক আন্দোলনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং প্রচলিত শ্রমিক আন্দোলনের চলমান ধারায় যে নেতা কর্মী তৈরি হয় তাতে অসৎ, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, দখলদার, চাঁদাবাজ, সমাজ বিধ্বংসী মাদকাসক্ত ও নীতি নৈতিকতাহীন কিছু নেতা ও কর্মীর সংখ্যাই বাড়ছে। যা একদিকে দেশ ও জাতিগঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে মেহনতি, বঞ্চিত শ্রমিকসমাজের মুক্তি ও কলকারখানার উৎপাদনমুখিতার পথেও বিরাট প্রতিবন্ধক। সুতরাং শ্রমিক আন্দোলনের প্রচলিত ধারার তুলনায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সৃষ্ট নতুন ধারা তার কর্মীগঠনের বৈশিষ্ট্যের অনন্য ও স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

কর্মসূচি:

হঠকারিতা, চরমপন্থা, অনিয়মতান্ত্রিকতা, বিধি বা আইনবহির্ভূত কর্মসূচি, শিল্প অর্থনীতির অগ্রগতি ও উৎপাদন বিঘ্নকারী জবরদস্তিমূলক সন্ত্রাসী কর্মপন্থাকে ধারণ করেই মূলত এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী সুবিধাভোগী নেতৃত্ব শ্রমিক আন্দোলনের প্রচলিত ধারাকে জিইয়ে রেখেছেন। যার খেসারত সাধারণ শ্রমিক মালিককে তথা দেশ ও জাতিকে যুগের পর যুগ দিয়ে যেতে হচ্ছে। তার মোকাবিলায় সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় উৎপাদনমুখী, শিল্প-শ্রমিকবান্ধব এক আদর্শিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিক আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়নের এক নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে। সেই কর্মপন্থা মোতাবেক প্রথমত: সাধারণ শ্রমজীবী ও পেশাজীবী তথা সর্বস্তরের

মানুষের কাছে ইসলামের কালজয়ী সুমহান শাশ্বত ঐশী বিধানের দাওয়াত পৌছানো হয়। ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামগ্রিক জীবন এবং সুবিচারপূর্ণ শান্তিময় সমাজগঠনের আহবান সংবলিত বই-কিতাব, সাহিত্য পুস্তিকা, ম্যাগাজিন, প্রচারসামগ্রী, লিফলেট, পোস্টার এবং তথ্যপ্রযুক্তির সব উপায় উপকরণ ব্যবহার করা হয়। দাওয়াতের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, সম্প্রীতি স্থাপন, যোগাযোগ, সাধারণ শ্রমিকসভা, র‌্যালি, মিছিল, দিবস পালন, গেইটসভা, পথসভা, মাহফিল, মতবিনিময়, সুধীসমাবেশ, সিম্পোজিয়াম-সেমিনার, ওয়ার্কশপ, গ্রুপ দাওয়াতি কাজ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যার মাধ্যমে কোনো রকম চাপ ব্যতিরেকেই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের হৃদয় মনকে আদর্শের মাধ্যমে জয় করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠনভুক্ত করার জন্য নেতা-কর্মীরা নিবেদিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সর্বদা কাজ করে থাকেন। এভাবে দাওয়াত পেয়ে সত্যের আলোয় আলোকিত হয়ে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতি বছর এ নতুন ধারার আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে। এভাবে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের দ্বারা কলকারখ-নায় ও শিল্পাঞ্চলসহ সকল পেশার মধ্যে শ্রমিক ইউনিট এবং শাখা গড়ে ওঠে। বিভাগ, মহানগরী, জেলা, পৌরসভা, থানা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পর্যায়ে আবাসিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ নতুন ধারার সংগঠন বিস্তৃতি লাভ করছে। এ কাজ করতে করতে সর্বস্তরে যোগ্য ও দক্ষ সংগঠক এবং ট্রেড ইউনিয়নিস্ট তৈরি হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে শাখায় শাখায় বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ ও শিক্ষামূলক বৈঠকাদি চলছে। এর মাধ্যমে আদর্শিক জ্ঞান, শ্রম আইন, শ্রমনীতি, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানচর্চার এক ব্যাপক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। শ্রমিক আন্দোলনের এ নতুন ধারার এটা অনন্য এক বৈশিষ্ট্য। সাথে সাথে সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে। সরকারি ও বেসকারি বিভিন্ন সংগঠন ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংস্থা আয়োজিত ট্রেনিংসমূহেও এ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেকে ভালো প্রশিক্ষক হিসাবেও অবদান রেখে যাচ্ছেন। শ্রমিকদের বিপদাপদ, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, রোগ-শোক, অভাব অনটনসহ অসহায় দুস্থ শ্রমিকদের পাশে থেকে এ সংগঠনের কর্মীরা শ্রমিক সেবামূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রেখে চলেছেন। এভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের পাশে থেকে এবং শ্রম আইন মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়নের কলাকৌশল রপ্ত করে শ্রমিক নেতৃত্বের জন্য একদল যোগ্য ও দক্ষ নেতা তৈরি হচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রচলিত ধারার বিপরীতে আদর্শিক নেতৃত্ব সৃষ্টির এ নতুন ধারা বাংলাদেশে শ্রমিক অঙ্গনকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক ও উৎপাদনবান্ধব এ কর্মপন্থা দেশবাসীর আস্থা অর্জন করেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন : যদিও দেশের শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুবিধা এবং তাদের সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধানকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের প্রচলিত ধারায় আজ তা নির্মমভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। কিছু কিছু নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করার জন্য মালিক পক্ষের অবৈধ সুবিধা ভোগ করে, শ্রমিকদের সাথে বেঈমানী করে, তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ঢালাও লুটপাট, সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক অপশক্তির হীন স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে, হঠকারী ও ধ্বংসাত্মক পন্থায় শ্রমিক আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করা বর্তমান ধারার বড় সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করে তাদের আইনানুগ সুবিধা দিতেই মূলত ট্রেড ইউনিয়নের সৃষ্টি। জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার কমিশনের ঘোষণাপত্র ২৩-২৫, বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ১৪, ১৫, আইএলও কনভেনশন ৮৭-৯৮ এবং বাংলাদেশের সংশোধিত শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১৭৫-২০৮ মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সুরক্ষিত করা হলেও কার্যত ভুল নেতৃত্বের হীনস্বার্থে সেসব অধিকার অনেকাংশে খর্ব হচ্ছে। ফলে এ সব আইন বিধানের সুফল শ্রমিকের ঘরে যচ্ছে না।

> **কুরআন মজিদে ও হাদিস শরিফে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে যেগুলোকে মৌলিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে শ্রমিকদের কল্যাণে শিল্প কারখানার উৎপাদনকে ও অর্থনীতি সচল রেখে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করা যায়। যার সুফল শ্রমিক মালিক উভয়ে ভোগ করতে পারে।**

নতুন ধারার শ্রমিক আন্দোলনের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতর। প্রচলিত আইন বিধানে প্রাপ্ত শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি মহান আল্লাহর বিধান ও মহানবী (সা)-এর অনুপম আদর্শের অনুসরণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে মালিক শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের দর্শন, অর্থনীতি ও উৎপাদনবান্ধব পলিসিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা নতুন ধারায় অনুসৃত হয় এ ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহর আলোকে মহানবীর (সা) মৌলিক দর্শনের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে– ১. পরোপকারী মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ (আল হাদিস)। ২. শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে মজুরি দিয়ে দাও (আল হাদিস)। ৩. তোমরা যা খাও তোমাদের অধীনস্থদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তা পরাও (আল হাদিস)। ৪. লভ্যাংশে শ্রমিকদের শরিক কর ও অতিরিক্ত কাজের বাড়তি মজুরি দাও (আল হাদিস)। ৫. তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন (আল কুরআন)। ৬. একটি বিড়াল আটকে রাখার কারণে একজন মহিলা জাহান্নামি হয়েছেন। ৭. একটি কুকুরকে পানি পান করানোর জন্য একজন নষ্টা মহিলা জান্নাতি হয়েছেন (আল হাদিস)। ৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এতেকাফ থেকে উঠে গিয়ে একজনের সমস্যার সমাধান করেছেন (আল হাদিস) কুরআন মজিদে ও হাদিস শরিফে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে যেগুলোকে মৌলিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে শ্রমিকদের কল্যাণে শিল্প কারখানার উৎপাদনকে ও অর্থনীতি সচল রেখে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করা যায়। যার সুফল শ্রমিক মালিক উভয়ে ভোগ করতে পারে। কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নের আইন ও কলাকৌশল শিক্ষা দিয়ে দক্ষ ট্রেড ইউনিয়নিস্ট তৈরি করা যায়। তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে খোদাভীতি সম্পন্ন সৎ নেতৃত্ব তৈরি করা যায়। নতুন নতুন সমিতি, সংস্থা, ক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ইত্যাদি গঠন ও রেজিস্ট্রেশন করে বেসিক ইউনিয়ন ও সিবিএতে উন্নত নৈতিকতার মডেল শ্রমিক নেতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব। ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও মাদকের মরণ ছোবল থেকে শ্রমিক ও শিল্পাঙ্গনকে এ নৈতিকতার আলো দিয়েই রক্ষা করা সম্ভব। এ নতুন ধারা অনুসরণ করে দাবিনামা, গেইট মিটিং, ডেপুটেশন, দরকষাকষি, ধর্মঘট, মিছিল, শ্লোগান, সিবিএ নির্বাচন, পোস্টার, ব্যানার, প্রচার প্রোপাগান্ডা, দিবস পালন, লে-অফ, লক-আউট ইত্যাদি ট্রেড ইউনিয়নের আইনসিদ্ধ কার্যক্রমেও উন্নত নৈতিকতা, সুস্থ পরিবেশ, সংযত আচরণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ শিল্পবান্ধব পরিস্থিতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটা আদর্শ স্থাপন করা সম্ভব। সাথে সাথে এ আদর্শিক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় মানবরচিত মতবাদের মোকাবিলায় আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান তথা ইসলামী শ্রমনীতির কালজয়ী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একদল আপসহীন কর্মীবহিনীও গড়ে ওঠে। যা কেবলমাত্র মেহনতি শ্রমিকসমাজের মুক্তি নয় বরং গোটা মানবতার মুক্তির সংগ্রামে অপরিহার্য এক নিয়ামক শক্তি। সে অর্থে শ্রমিক আন্দোলনের প্রচলিত ধারার মোকাবিলায় এই নতুন ধারার আন্দোলন মূলত ইসলামী শ্রমনীতি ও ইসলামী সমাজ বিপ্লবের এক ও অভিন্ন সংগ্রাম। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সেই নতুন ধারারই নাম বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। জাতিসংঘ, আইএলও, শ্রম দফতরসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশাজীবী ও শ্রমিক সংগঠনের কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের সাথেও নিবিড় যোগাযোগ, সুসম্পর্ক, মতবিনিময়ের মাধ্যমে এ ধারার ট্রেড ইউনিয়নকে একটি যুগোপযোগী বাস্তবমুখী ও বিশ্বমানের ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সংগঠন পরিচালনা: সংগঠন পরিচালনায় নেতৃত্ব, আনুগত্য, শৃঙ্খলা, পরামর্শের নীতি, নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের জনশক্তির সংশোধনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সমালোচনার সুযোগ ও নীতি পরিকল্পিত কাজ দেয়া ও নিয়মমাফিক জবাবদিহিতা বা রিপোর্টিং, পরিচ্ছন্ন ও সুসংহত কোনো নীতিমালা প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নের ধারায় নেই বললেই চলে। যার ফলে নেতৃত্বের কোন্দল, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা, অর্থলোলুপতা ও সন্ত্রাস সহিংসতার ধ্বংস জোয়ারে বর্তমান ট্রেড ইউনিয়নের ধারা বিপন্ন। সংগঠনের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে জবরদস্তি, চাঁদাবাজি, হুমকি-ধামকি, রজনৈতিক মতবাদ বা দলের ভাড়াটিয়া হিসাবে নির্লজ্জ লেজুড়বৃত্তি, বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তি, সংস্থা ও বিভিন্ন এনজিওর কাছে শ্রমিক স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে বিপুল অর্থের লুটপাট চলছে সমানে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আচরণ দেখলে মনে হয় কারো টাকায় বিক্রি হওয়া গোলাম। শ্রম দফতরে নিবন্ধনসহ নানান দরকষাকষি কাজে প্রকাশ্যে চলছে ঘুষ লেনদেনের প্রতিযোগিতা। এক সময়ের সম্বলহীন শ্রমিক নেতারা এখন গাড়ি, বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট ও কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালান্সের মালিক। সুস্থ ও শ্রমিকবান্ধব ট্রেড ইউনিয়নের চরিত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। চলমান ধারার এ নৈরাজ্যের বিপরীতে একটি সুস্থ সবল সুসংহত শ্রমিক-মালিকবান্ধব ট্রেড ইউনিয়নের নতুন ধারা আজ দেশে বিকাশমান। যেখানে সংগঠন পরিচালনায় একটি সুলিখিত গঠনতন্ত্র ও ঐতিহ্যের অনুসরণ করা হয়। রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি। নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইসলামী ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করে তার চর্চা ও অনুশীলন করা হয়। নেতৃত্বের জবাবদিহিতা, পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তের চমৎকার নীতিমালা ও নেতাকর্মীদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি পবিত্র নৈতিক সাংগঠনিক বন্ধন এই নতুন ধারার সৌন্দর্য ও শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে। সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের আত্মসংশোধনের উদ্দেশ্যে রয়েছে পারস্পরিক সমালোচনা ও কল্যাণ কামনার এক বেহেশতি পরিবেশ। যা পারস্পরিক সম্পর্ককে তিক্ত ও নষ্ট করার বদলে বরং দৃঢ় ও অটুট করে দেয়। সংগঠন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য ইউনিয়ন চাঁদা ছাড়াও প্রতিমাসে সংগঠনের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কর্মীদের নিয়মিত আর্থিক অনুদান এ ধারার আন্দোলনে বিরাট অন্তর্নিহিত শক্তির জোগান দিচ্ছে। এ ছাড়াও সুধী শুভাকাঙ্ক্ষীদের দান ও দ্বীনপ্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নির্দেশিত খাতে অর্থ ব্যয়ের প্রেরণা এ ধারার বড় শক্তির উৎস। মজলুম, নিপীড়িত, অভাবী, রুগ্ন, দুস্থ, বিপদাপন্ন, অনাহারী মেহনতি মানুষের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মহান আল্লাহ ও প্রিয়নবী (সা) এর আদেশ ও আদর্শের অনুসরণে এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তহবিল গঠিত হতে থাকে। সংগৃহীত তহবিলের জমা খরচের সুষ্ঠু হিসেবের পদ্ধতিমাফিক সংরক্ষণ, আমানতদারিতা, অডিট ও নিয়মিত আয় ব্যয় হিসেব উপযুক্ত ফোরামে পেশ করার বিধান অনুসরণ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এ ধারার আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়। যথাসময়ে ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহের রিটার্ন দাখিল ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যাংক হিসেব পরিচালনা করা হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, নির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ, বিভিন্ন সাব-কমিটি, বিভাগ, মহানগরী, জেলা, উপজিলা/ থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট, পেশাভিত্তিক ও শিল্পাঙ্গনভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে এ ধারার সংগঠন পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদভিত্তিক পরিকল্পনা ও রিপোর্টিং পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বস্তরের সংগঠনের কাজের পর্যালোচনা ও অগ্রগতি তত্ত্বাবধান করা হয়। সকল শাখার গঠনতান্ত্রিক মেয়াদ শেষে কমিটি সমূহের নির্বাচন, কমিটি গঠন

করে সংশ্লিষ্ট শ্রম দফতরের অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র, জমা হয়। সময়ের চাহিদা মোতাবেক সুনির্দিষ্ট ফোরামে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট শ্রম দফতরের অনুমোদন নেয়া হয়। নতুন নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও রেজিস্ট্রেশনে উৎসাহিত করা হয়। এ বিষয়ে পৃথক দায়িত্বশীল মনোনীত করে সব কাজকর্ম সুচারুরূপে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা হয় বছরব্যাপী। এভাবে শ্রমিক আন্দোলনে সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি স্বতন্ত্র ও নতুন ধারার নেতৃত্ব দিচ্ছে।

উপসংহার : বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের আলোচিত এই নতুন ধারার সৃষ্টিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনই একক অবদান রেখে চলেছে। ষাটের দশকে এ দেশের শ্রমিক ময়দানে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সমাজতন্ত্রী তথা মানবরচিত নাস্তিক্যবাদী মতবাদের সর্বনাশা স্রোতের ধ্বংস জোয়ার প্রবাহিত হচ্ছিল। তার বিপরীতে হতভাগ্য মেহনতি শ্রমিকসমাজকে প্রকৃত মুক্তির সুবহে সাদিকে পৌছে দিতেই তখন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃত্বে নতুন ধারার এই চ্যালেঞ্জিং অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল। অনেক চড়াই উতরাই ও কন্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে এ ধারা আজ দ্রুত বিকাশমান এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে দেশবাসীর কাছে তথা শিল্প শ্রমিক অঙ্গনে স্বীকৃত ও সমাদৃত। ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন এবং একটি কল্যাণময় ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অভিন্ন প্রত্যয় ও অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শহর, নগর, বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে তথা শিল্প শ্রমিকের সকল সেক্টরের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আজ মানবমুক্তির সংগ্রামের এই পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। মহান আল্লাহর ঐশী বিধান ও মহানবী (সা) এর অনুপম আদর্শের শ্লোগানে শ্লোগানে তাই শ্রমিক জনপদ আজ মুখরিত। ১৯৬৫ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইনের আওতায় ১৯৬৮ সালের ২৩ মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সরকারি শ্রম দফতরে যার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছিল জাতীয় ফেডারেশন নাম্বার ০৩। পরবর্তী কালে ১৯৬৯ সালে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ও ১৯৭৭ সালের শিল্প সম্পর্ক বিধিমালার বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারের Labour directorate এ ১৯৮০ সালের ১৫ মে দ্বিতীয়বার নিবন্ধন লাভ করে। যার রেজিস্ট্রেশনের নাম্বার বাংলাদেশ জাতীয় ফেডারেশন (বা.জা.ফে) ০৮। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠাকালীন (১৯৬৮-৭২) কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন মরহুম ব্যারিস্টার কুরবান আলী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ড. গোলাম সরওয়ার। বহু চড়াই উতরাই পার হয়ে ফেডারেশনটি আজ অর্ধশতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী একমাত্র শ্রমিক সংগঠন। জন্মলগ্ন থেকেই এ ফেডারেশন দক্ষতা, আন্তরিকতা, সততা ও যোগ্যতায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে শত শত বেসিক ইউনিয়ন ও পেশাভিত্তিক ফেডারেশন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে শ্রমিকদের কল্যাণে অব্যাহত গতিতে কাজ করে যাচ্ছে।

ফেডারেশনটি International Labour Organisation (ILO) এর অনুসমর্থিত কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ দ্বারা সমর্থিত। International Islamic Confederation of Labour (IICL) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এর নির্বাচিতসহ-সভাপতি (Vice President)

শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের কালজয়ী আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হয়ে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে চলমান এই নতুন ধারাকে আরও বেগবান ও শক্তিশালী করার জন্য মুক্তিকামী মেহনতি জনতার প্রতি আকুল আহবান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তার সন্তুষ্টির পথে কবুল করুন। আমিন।

লেখক : সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

লেখা আহ্বান

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল : ০১৯৯২৯৫১৩৬৪, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail : sramikbarta2017@gmail.com

ইসলামী আন্দোলনের গণভিত্তি রচনায় শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা

এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ

ইসলামী আন্দোলন বলতে মানবজীবনের সবদিক ও বিভাগে অন্য সকল মতবাদের উপর আল্লাহর দ্বীনকে একটি বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রামকে বুঝায়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে একে 'জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ' বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- "তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং 'দ্বীনে হক' দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন, চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন। হে ঈমান আনয়নকারীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আজাব থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো এটাই তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর যদি তোমরা তা জান। (সূরা আস-সফ : ৯-১১) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইসলামী আন্দোলনের এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য। কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রে সামগ্রিক পরিবর্তন আনতে হলে আদর্শভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়। এরূপ আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে বলা হয় ইসলামী বিপ্লব। ইসলামী আন্দোলন একটি আদর্শিক আন্দোলনের নাম। এটি নিছক ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন নয়। তাই কোন দাবি-দাওয়া বা সাময়িক ইস্যুতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য হতে পারে না। জনগণকে ঈমানের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রের মাঝে পরিবর্তন আনতে হবে। সেই সাথে মানুষের অন্তরে জান্নাত লাভের

ইসলামী আন্দোলন একটি আদর্শিক আন্দোলনের নাম। এটি নিছক ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন নয়। তাই কোন দাবি-দাওয়া বা সাময়িক ইস্যুতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য হতে পারে না। জনগণকে ঈমানের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রের মাঝে পরিবর্তন আনতে হবে। সেই সাথে মানুষের অন্তরে জান্নাত লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয় সৃষ্টি করতে হবে।

তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয় সৃষ্টি করতে হবে। যাতে তারা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। ইসলাম নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তনে বিশ্বাসী। তাই পর্দার অন্তরালে আঁতাত ও গোপন কৌশল বা কোন সশস্ত্র কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করা সত্যিকার ইসলামী বিপ্লবের মডেল হতে পারে না। নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক উপস্থাপিত কর্মপন্থাই ইসলামী বিপ্লবের সঠিক মডেল। বিশ্বের সেরা বিপ্লবী মহানবী (সা) এর নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য বা উপাদান প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথম উপাদান হলো, সামজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরের জন্য একদল ঈমানদার, সৎ, যোগ্য ও দক্ষ লোক তৈরি করা। দ্বিতীয় প্রধান উপাদান হলো, ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে দেশব্যাপী জনমত গড়ে তোলা। অর্থাৎ যে এলাকায় আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা চলে সেখানকার জনগণকে এতটুকু প্রস্তুত করা যাতে তারা আল্লাহর আইন মেনে চলতে রাজি হয়। অন্যথায় ইসলামী বিপ্লব সফল হতে পারে না। নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, জনগণ যতক্ষণ না তাদের আন্দোলনে শামিল হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সমাজে কোন বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। উপরের আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে ইসলামের দৃষ্টিতে জনগণই হচ্ছে সমাজের উত্থান-পতন ও সমাজ পরিবর্তনের মূল উপাদান। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে শ্রমিকদের অবস্থান ও ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গণভিত্তি কী ও কেন? গণভিত্তি হচ্ছে জনগণের মাঝে স্থায়ী আসন বা অবস্থান তৈরি তথা সমাজের সবপর্যায়ের মানুষের মাঝে আন্দোলন ও সংগঠনকে জনপ্রিয় করে তোলার নাম। ইসলামী সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণের দৃঢ় আস্থা, ত্যাগের মানসিকতা এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সমর্থন আদায়ের যোগ্যতাকে ইসলামী আন্দোলনের গণভিত্তি বলা হয়। এ গণভিত্তি মূলত ব্যাপক দাওয়াতি কাজ এবং নেতা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সমন্বয়েই রচিত হয়। কেবল জনশক্তির উন্নত ক্যারিয়ার থাকলেই গণভিত্তি রচনা করা যায় না। এর সাথে নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনীর সামাজিক চরিত্র থাকতে হবে। কেননা প্রত্যেক জনশক্তির ব্যক্তিগত গণভিত্তির সমন্বিত যে রূপ তা আন্দোলনের গণভিত্তিতে পরিণত হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে কোন এলাকা বা শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব বলয়ে এনে সেখানে একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য গণভিত্তি রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইসলামী আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনের জন্য শক্তিশালী গণভিত্তির কোন বিকল্প নেই। কারণ মজবুত গণভিত্তি না থাকলে হাজার হাজার যোগ্য কর্মী থাকা সত্ত্বেও সংগঠন ও আদর্শের বিপর্যয় হতে পারে। পাশাপাশি ইসলামী বিপ্লবের সফলতা ও স্থায়িত্ব হুমকির মধ্যে পড়তে পারে। তাই বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে শ্রমজীবীসহ সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে সংগঠনের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসার মাধ্যমে আন্দোলনের গণভিত্তি রচনা করা অপরিহার্য। বস্তুত কোন এলাকা বা শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের গণভিত্তি রচনার কাজ তখনই ত্বরান্বিত হবে যখন সেখানে অবস্থানরত সাধারণ শ্রমিক, মালিক ও প্রভাশালীদের মাঝে সংগঠনকে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হবে।

শ্রমিক অঙ্গনে গণভিত্তি রচনা: সাধারণত যারা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে তাদেরকে শ্রমিক বলা হয়। আবার মজুরির বিনিময়ে যারা কাজ করে তাদেরকেও শ্রমিক বলা হয়ে থাকে। International Labor Organization (ILO)-এর সংজ্ঞা হলো, যারা Non-Decent Work করে তারাই শ্রমিক।

Decent Work is work that-

১. is meaningful and productive (অর্থপূর্ণ ও উৎপাদন সম্পর্কিত)

২. pays a living wage (জীবন যাপনের ব্যয় অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ)

৩. provides benefits and social protections (সুবিধাদি ও সামাজিক নিরাপত্তার জোগান)

৪. is protected by strong labour laws that guarantee workers' rights, including freedom of association. (শক্তিশালী শ্রম আইন দ্বারা কাজের নিশ্চয়তার অধিকার ও অ্যাসোসিয়েশন করার স্বাধীনতা)

Non-Decent Work- উপরোক্ত ৪টি বৈশিষ্ট্যের যেকোন ১টি অনুপস্থিত থাকলে, তাকে Non-Decent Work বলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, শ্রমিক রিপোর্ট-২০১৮ এর তথ্যসূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে মোট শ্রমিক শ্রেণীর জনসংখ্যা-৬ কোটি ৩৫ লক্ষ, এর মধ্যে পুরুষ- ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ এবং নারী-২ কোটি। শহরাঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর জনসংখ্যা-১ কোটি ৭৯ লক্ষ এবং গ্রামাঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর জনসংখ্যা- ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ। কর্মরত শ্রমজীবীর সংখ্যা- ৬ কোটি ৮ লক্ষ, এর মধ্যে পুরুষ- ৪ কোটি ২২ লক্ষ এবং নারী- ১ কোটি ৮৬ লক্ষ। শ্রমজীবীদের মধ্যে কৃষি কাজে নিয়োজিত ৪০.৬%, শিল্প কলকারখানার কাজে নিয়োজিত ২০.৪%, চাকরিতে নিয়োজিত ৩৯.০%। শ্রমজীবী জনসংখ্যার মধ্যে ১৫ থেকে ২৯ বছরের শ্রমিক সংখ্যা- ২ কোটি ১ লক্ষ, এর মধ্যে পুরুষ- ১ কোটি ৩২ লক্ষ এবং নারী- ৭২ লক্ষ। এ তথ্যসূত্র মতে বাংলাদেশের মোট জনশক্তির একটি বড় অংশ হলো শ্রমিক। তাই ইসলামী আন্দোলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে হলে শ্রমিক অঙ্গনেও সর্বোচ্চ গণভিত্তি রচনা করতে হবে। শ্রমিক অঙ্গনে গণভিত্তি রচনা হচ্ছে, শিল্প-কারখানা মালিকসহ সকল শ্রেণী ও পেশার সাথে জড়িত শ্রমজীবী মানুষের মাঝে সংগঠনের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করে তোলা। বিশেষ করে কোন শ্রমিক অঞ্চল ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন ও সংগঠনের নেতৃত্বে দাবি আদায়ের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মানসিকতা তৈরি করা।

শ্রমিক অঙ্গনে গণভিত্তি রচনা কেন প্রয়োজন: শ্রমিকরা হচ্ছে মানবসভ্যতার কারিগর এবং আন্দোলন-সংগ্রামের নিয়ামক শক্তি। অতীতের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তাদের রয়েছে অবিস্মরণীয় ভূমিকা। ইসলামী আন্দোলনেও শ্রমিকসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ ছাড়া পেশাগত কারণে শ্রমিকগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে ভূমিকা পালন করতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে কৌশলগত নিয়ন্ত্রণও তাদের দ্বারা সম্ভব। তাই আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হাসিলের জন্য শ্রমিক অঙ্গনে গণভিত্তি রচনা করা প্রয়োজন।

দুনিয়াজুড়ে এ শ্রমিক শ্রেণীকেই ইসলাম ও মানবতাবিরোধী শক্তি সবচেয়ে বেশি প্রতারিত করেছে এবং এখনও করছে। আমাদের দেশেও বস্তুবাদী সভ্যতার ধারক বাহকরা শ্রমিকদেরকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে সুবিধাবাদী শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়ন হলেও মেহনতি জনতাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ইসলাম শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার যতটুকু নির্ধারণ করেছে তা অন্য কোনো মতাদর্শে নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলো ইসলামের দুশমনরা সরলমনা শ্রমিক ও মেহনতি মানুষগুলোকে উল্টো ধারণা দিয়ে ইসলাম ও

ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ইসলামবিরোধী শক্তির প্রবঞ্চনার কবলমুক্ত করে এদেরকে ইসলামী আন্দোলনের প্রভাববলয়ে আনতে পারলে যে কোনো এলাকায় গণভিত্তি রচনার কাজ সহজ হয়ে পড়বে। এ লক্ষ্যে শিল্প-কারখানাসহ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর ও ট্রেডের শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষদের নিয়ে পরিকল্পিতভাবে আকর্ষণীয় দাওয়াতি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করলে অনেক ভালো ফল পাওয়া যাবে। তাদের সাথে সুন্দর আচরণ এবং মানবিক আবেদন পূরণে এগিয়ে আসতে হবে, দুঃখ-দুর্দশার খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। একই সাথে তাদের নিয়ে গঠিত সংগঠন ও সংস্থাগুলো সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণে আনার জোর তৎপরতা চালাতে হবে। সেই সাথে শ্রমিকদের সন্তানদের সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত করার মাধ্যমে গণভিত্তি রচনার কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।

গণভিত্তি রচনায় শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা: শ্রমিক সংগঠন বলতে বুঝায় যে সংগঠন বা সংস্থা শ্রমিকদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া নিয়ে কাজ করে। মূলত শিল্প-কারখানা এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা পেশার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষায় নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নকে শ্রমিক সংগঠন বলা হয়। আর শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা সরকারি-বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় নিয়োজিত শ্রমিকদের নির্বাচিত ট্রেড ইউনিয়নকে সিবিএ বা কালেকটিভ বারগেইনিং এজেন্ট বলা হয়। এসব শ্রমিক সংগঠন হলো শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, চাকরির নিরাপত্তাসহ তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন। অপর দিকে অবহেলিত ও নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশন জাতীয় পর্যায়ের শ্রমিক আন্দোলনে ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন অনুরূপ একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন। এর মাধ্যমে সারাদেশের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হলে যে কোন আন্দোলনের জন্য তারা একটি নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হতে পারে। এজন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ভিশন নির্ধারণপূর্বক দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও সাংগঠনিক শাখাগুলোতে ইসলামী আন্দোলনের মজবুত গণভিত্তি রচনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শ্রমিক অঙ্গনে গণভিত্তি রচনার পদ্ধতি: হঠাৎ করে বা চমক লাগানো কোনো কর্মসূচির মাধ্যমে রাতারাতি ইসলামী আন্দোলনের গণভিত্তি রচনা করা সম্ভব নয়। বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরলস কাজ করার মধ্য দিয়ে গণভিত্তি রচনার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তার কয়েকটি দিকের উপর নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

১. বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা: গণভিত্তি রচনার জন্য সর্বপ্রথম সংশ্লিষ্ট এলাকাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে Well Plan is half done অর্থাৎ সঠিক পরিকল্পনা কাজের অর্ধেক। পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (ক) পরিকল্পনার Objective কী হবে তা নির্ধারণ; (খ) এলাকা বা প্রতিষ্ঠানের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন; (গ) কাজের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ কী কী, এগুলো চিহ্নিত করে দূর করার জন্য কী কী ব্যবস্থা আছে; (ঘ) কাজের ক্ষেত্রে কী কী সম্ভাবনা আছে এবং সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর কী কী সুযোগ আছে এবং (ঙ) নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনীর সংখ্যা ও মান এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংগঠনের সক্ষমতা কতটুকু তা নিরূপণ করা।

তা ছাড়া একটি নিখুঁত পরিকল্পনা গ্রহণের স্বার্থে পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্বিক অবস্থার উপর একটা যথাযথ জরিপ চালাতে হবে। যেমন- ক) এলাকার আয়তন ও সীমানা নির্ধারণ; খ) মোট জনসংখ্যা কত; গ) মোট শ্রমিক সংখ্যা কত; ঘ) শ্রমজীবী নারী-পুরুষের সংখ্যা পৃথকভাবে নির্ধারণ; ঙ) বেকার শ্রমিক সংখ্যা কত; চ) শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ; ছ) শিক্ষার হার কত; জ) স্বাস্থ্যসেবা কেমন; ঝ) এলাকায় কতটি হাট-ঘাট ও শ্রমিক অঞ্চল আছে এবং (ঞ) কতটি শিল্পকারখানা আছে ইত্যাদি।

> ❝ শ্রমিকরা হচ্ছে মানবসভ্যতার কারিগর এবং আন্দোলন-সংগ্রামের নিয়ামক শক্তি। অতীতের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তাদের রয়েছে অবিস্মরণীয় ভূমিকা। ইসলামী আন্দোলনেও শ্রমিকসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ ছাড়া পেশাগত কারণে শ্রমিকগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে ভূমিকা পালন করতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে কৌশলগত নিয়ন্ত্রণও তাদের দ্বারা সম্ভব। তাই আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হাসিলের জন্য শ্রমিক অঙ্গনে গণভিত্তি রচনা করা প্রয়োজন। ❞

পরিকল্পনা প্রণয়নকালে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে: (ক) পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট, পরিমাপ যোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তবভিত্তিক সময়াবদ্ধহতে হবে। (খ) পরিকল্পনার সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিন ধরনের সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে: যথা- (১) স্বল্পমেয়াদি, (মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক) (২) মধ্যমেয়াদি (৩ বছর থেকে ৫ বছর) এবং (৩) দীর্ঘমেয়াদি (১০ বছর থেকে অধিক)।

২. পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কৌশল নিরূপণ করা: গণভিত্তি রচনার জন্য গৃহীত বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও কৌশল নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই জাতীয় ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে বিশেষ পরিকল্পনার আলোকে কোন ধরনের কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে তা যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে। সেই সাথে সুনির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মবন্টন করতে হবে। এরপর নিয়মিত মনিটরিং, পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানেরও ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর ধারাবাহিকতায় যথাযথভাবে মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি করে পর্যালোচনাপূর্বক সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন রিপোর্টে সেক্টরভিত্তিক নির্ধারিত টার্গেট ও লব্ধ আউটপুটের মধ্যে যে ব্যবধান তৈরি হবে তার আলোকে সংযোজন ও বিয়োজন করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

৩. মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা: সংগঠন হচ্ছে যে কোন আন্দোলনের শক্তিশালী বাহন। সাংগঠনিক দুর্বলতামুক্ত একটি মজবুত সংগঠনই পারে আন্দোলনের বাহন হিসাবে ভূমিকা পালন করতে। কোন এলাকায় গণভিত্তি রচনার জন্য গৃহীত সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়নে এবং বিরোধীশক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সংগঠনের ভূমিকাই মুখ্য। তাই ইসলামী আন্দোলনকে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে জনপ্রিয় করতে হলে সমগ্র এলাকায় পেশা ও ট্রেড-ভিত্তিক সংগঠনের সক্রিয় নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য শিল্প-কারখানা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পরিবহন, ওয়ার্কশপ, স্ট্যান্ড, হাট-ঘাট, বাজার ও বন্দরসহ সর্বত্র পরিকল্পিতভাবে সংগঠনের ইউনিট কায়েম করতে হবে। শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান এবং অধিকার আদায়ে

তাই ইসলামী আন্দোলনকে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে জনপ্রিয় করতে হলে সমগ্র এলাকায় পেশা ও ট্রেড-ভিত্তিক সংগঠনের সক্রিয় নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য শিল্প-কারখানা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পরিবহন, ওয়ার্কশপ, স্ট্যান্ড, হাট-ঘাট, বাজার ও বন্দরসহ সর্বত্র পরিকল্পিতভাবে সংগঠনের ইউনিট কায়েম করতে হবে। শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান এবং অধিকার আদায়ে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে গণজাগরণ সৃষ্টি করে সংগঠনকে গণসংগঠনে পরিণত করতে হবে।

ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে গণজাগরণ সৃষ্টি করে সংগঠনকে গণসংগঠনে পরিণত করতে হবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করলেই চলবে না, তাদেরকে সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত করতে হবে। সেই সাথে তাদের নৈতিকমান ও মানবীয় যোগ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে আন্দোলন ও সংগঠনের যোগ্য জনশক্তি রূপে গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় জনসমর্থন বিরাট বিপদের কারণ হতে পারে।

৪. গণমুখী শ্রমিক নেতৃত্ব তৈরি করা: যে কোন আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হলো নেতৃত্ব। নেতৃত্ব যত গতিশীল, সামাজিক ও গণমুখী চরিত্রের অধিকারী হবে আন্দোলন তত দ্রুত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। সংগঠন ও আন্দোলন উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। বাংলাদেশে ইসলামের প্রতি মানুষের বিপুল জনসমর্থন রয়েছে। তথাপি ইসলামী আন্দোলনের গণভিত্তি দুর্বল। তাই এ জনসমর্থনকে মজবুত গণভিত্তিতে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন গণমুখী নেতৃত্ব। তাই শ্রমিক অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে শ্রমজীবী মানুষের কাছাকাছি যেতে হবে এবং তাদের সাথে নিঃসংকোচে মিশতে হবে। শ্রমিকদের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি অর্জন এবং তাদের আপনজন তথা আস্থাভাজন হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। কেননা শ্রমজীবীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং জনমত সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহের নিকট গ্রহণযোগ্য শ্রমিক নেতৃত্ব সামনে আনতে না পারলে নিছক আদর্শের কথা বলে শ্রমিক আন্দোলন এগিয়ে নেয়া কঠিন। তৎকালীন আরবের জাহেলি সমাজে রাসূল (সা)-এর নৈতিক প্রভাব ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এত বেশি ছিল যে কাফের মুশরিকরাই তাকে আল আমিন উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং তার কাছেই তাদের সম্পদ গচ্ছিত রাখত। এতে বুঝা যায় কাফেরেরা রাসূল (সা) কে আদর্শিকভাবে গ্রহণ না করলেও তাকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করেছিল। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে সততা ও আমানতদারিতার পাশাপাশি পথ চলার সময় ব্যাপক সালাম বিনিময়, আলাপ-আলোচনা, বিবাহ, মাহফিল, জানাজার নামাজসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বিপদ-আপদে সাধারণ শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো ও ধৈর্যের

সাথে তাদের দুঃখ দুর্দশা শ্রবণ ও মোচনের চেষ্টা ইত্যাদির মাধ্যমে নেতৃত্বের সামাজিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া মেহনতি জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অগ্রগামী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সমাজসেবক হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি আদায় করতে হবে।

৫. নারীশ্রমিকদের মাঝে অবস্থান মজবুত করা: আদিকাল থেকেই সমাজ পরিবর্তন ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে নারীসমাজ একটি শক্তিশালী ভূমিকা রেখে আসছে। আজকের দুনিয়াতেও নারীসমাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় নারীদের সহযোগিতা ছাড়া কোন সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন সফল হতে পারে না। তাই ইসলামী আন্দোলনকে একটি গণআন্দোলনে রূপ দিতে হলে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ অনিবার্য। আর বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক যেমন নারী তেমনি শ্রমিক অঙ্গনের বড় একটি অংশ নারীশ্রমিক। বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে বিপুল সংখ্যক নারীশ্রমিক দেশের রফতানি বাণিজ্যে অবদান রাখছে। এসব নারীশ্রমিক স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে অধিকাংশই অবহেলিত। ইসলাম নারীদের যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা তুলে ধরে নারীশ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং তাদের মাঝে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান আরো মজবুত ও শক্তিশালী করতে হবে। বস্তুত নারীদের মাঝে অবস্থান মজবুত হওয়া মানে প্রতিটি পরিবারে ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি শক্তিশালী হওয়া। এজন্য শ্রমিক অঙ্গনেও নারীদেরকে তাদের অবস্থান থেকেই ইসলামী আন্দোলনের কাজে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অভাবে নারীসমাজ বিভ্রান্ত হচ্ছে। বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন করে ইসলামের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের সাথে তাদের পরিচিত করতে হবে। নারীসমাজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় এবং প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. ব্যাপক দাওয়াতি তৎপরতা চালানো: সংগঠনের গঠনমূলক কাজের সাথে সাথে ইসলামী আন্দোলনের মজবুত গণভিত্তি রচনার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ব্যাপক দাওয়াতি তৎপরতা চালাতে হবে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) এর জামায়াতে ইসলামী গঠনের সূচনালগ্নের কথাটি উল্লেখ করা যায়- "আমাদের গঠনমূলক সকল চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি তার পেছনে মজবুত জনমত সৃষ্টি না হয়। গঠনমূলক কাজ ব্যতীত যেমন কোন ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না, তেমনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামী দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার ব্যতীত এ ধরনের কোন বিপ্লব সম্ভব নয়।"

অতএব শ্রমজীবী মানুষের মাঝে বলিষ্ঠ জনমত ও মজবুত গণভিত্তি গড়ে তোলার জন্য ইসলামের সঠিক দাওয়াত তাদের ঘরে ঘরে পৌছানোর কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক) মৌখিকভাবে ইসলামী আদর্শের ব্যাপক প্রচার- শ্রমিক অঙ্গনের স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের মাঝে দাওয়াতি কাজের মৌখিকপদ্ধতি নিঃসন্দেহে সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম। এ মৌখিকপদ্ধতিতে সংগঠন নির্ধারিত কর্মপন্থা অবলম্বনে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায়ও দাওয়াতি কাজ করা যায়। যেমন- ব্যক্তিগত ও টার্গেটভিত্তিক দাওয়াতি কাজ, শ্রমিক অঞ্চলে নিয়মিত গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতি কাজ, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে পরিকল্পিত দাওয়াতি কাজ ইত্যাদি। আবার স্বল্পকালীন অভিযানও পরিচালনা করা যেতে পারে। যেমন সপ্তাহ বা পক্ষ ঘোষণা করে পাড়া-মহল্লায় এবং প্রতিটি ঘরে দাওয়াত পৌছানো যেতে পারে। তা ছাড়া সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে তা'লিমুল কুরআন, সহিহ্ করে নামায পড়ার পদ্ধতি শিখানো, দোয়া-কালাম ও মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষার আসর, রমজানে ইফতার মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল ও সমাবেশের আয়োজন করা এবং মসজিদে জুমার খুতবা ও ঈদের জামায়াতের পূর্বে বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে। এভাবে নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত শ্রমিকদের মধ্যে দাওয়াতি তৎপরতা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাপক পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে অডিও বুক (ক্যাসেট/মেমোরি কার্ড) ইসলামী দাওয়াতের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

খ) লিখিত পদ্ধতিতে দাওয়াত সম্প্রসারণ- ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত শ্রমজীবী মানুষের মাঝে পৌছানোর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে:

i. প্রচারপত্র বিলি- শ্রমজীবী মানুষের উপযোগী করে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া, ইসলামী সমাজব্যবস্থার সুফল, জাহেলি সমাজব্যবস্থার কুফল এবং দুঃশাসনের কবল থেকে মুক্তি ও পরকালীন নাজাতের পথ নির্দেশ করে বিভিন্ন ধরনের প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের মূল দাওয়াতি বক্তব্য তাদের ঘরে ঘরে পৌছানোর ব্যবস্থা করা।

ii. দেয়াল লিখন ও পোস্টারিং- ইসলামী আন্দোলনের মূল বক্তব্যের সাথে শ্রমিকদেরকে পরিচিত করা এবং জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় দেয়াল লিখন ও পোস্টারিংয়ের উদ্যোগ খুবই ভালো ফলাফল বয়ে আনে। যেমন-'সকল হাতে কাজ চাই, সবার মুখে ভাত চাই' 'ভাত, কাপড়, বাসস্থান ইসলামই দেবে সমাধান' সংগঠনের এসব শ্লোগানকে শ্রমিক-জনতার শ্লোগানে পরিণত করতে হবে।

iii. কোরআনের তাফসির, হাদিস গ্রন্থ ও ইসলামী সাহিত্য, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, শ্রমিক বার্তাসহ বিভিন্ন সাময়িকী বিক্রি ও বিলি– এসব দাওয়াতি উপকরণ বিক্রি ও বিলি করে শ্রমিকদের হৃদয়ে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য জনগণের মধ্যে এসব বিক্রি ও বিলির ব্যবস্থা করা এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

গ) আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ– সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অথবা ইসলামী বিপ্লবের চেতনাসম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন ও ওয়ায়েজদের বক্তৃতা-ভাষণ এবং কুরআনের তাফসির শ্রমিকদের মাঝে দাওয়াত পৌছানোর ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তাই এ জাতীয় বক্তাদের সিডি ও মেমোরিকার্ড ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া অনলাইন চ্যানেল ও সোস্যাল মিডিয়ায় গ্রুপ তৈরি করা ও এগুলো প্রচার করার উদ্যোগ নিতে হবে।

ঘ) অপসংস্কৃতি রোধ ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ– পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণ্যবাদী ও অপসংস্কৃতির সয়লাবে আজও শ্রমিক যুবসমাজ ভেসে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ফিল্মের নগ্ন অনুষ্ঠান, অশ্লীল পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন ও সিনেমার নৈতিকতাবিধ্বংসী ছায়াছবি এবং আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার ও পর্নোগ্রাফির অবাধ প্রসার নতুন প্রজন্মের চরিত্রকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। অপর দিকে সংস্কৃতির আবরণে নাটকে ইসলাম ও আলেমসমাজ সম্পর্কে পরিবেশিত বিকৃত রূপ তরুণ শ্রমিকদের ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন থেকে দিন দিন দূরে সরিয়ে রাখছে। অপসংস্কৃতি অপপ্রচারের মতোই ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন অর্জনের পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থার নিরসনকল্পে শ্রমিকদের মাঝে ইসলামী আন্দোলনের গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হলে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে

হবে। একইসাথে দাওয়াতি কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন দিবস ও ইস্যুতে শ্রমিকদের জন্য দেশপ্রেম ও ইসলামী চেতনা সংবলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

ঙ) গণসংযোগ অভিযান ও সফর- ব্যাপক দাওয়াতি তৎপরতার মাধ্যমে আন্দোলনের গণভিত্তি রচনার আরেকটি ফলপ্রসূ পদক্ষেপ হচ্ছে নেতৃত্বের সাথে জনগণের সেতুবন্ধ তৈরির উদ্দেশ্যে গণসংযোগ অভিযান ও ব্যাপক সফর প্রোগ্রাম। আল্লাহর রাসূল (সা) যেমন মানুষের ঘরে গিয়ে হাজির হতেন ঠিক তেমনি ইসলামী আন্দোলনের শ্রমিক নেতৃত্বকেও শ্রমজীবী মানুষের নিকট পৌঁছার জন্য গণসংযোগ অভিযান বা বিভিন্ন ইস্যুতে এলাকায় সফর করতে হবে। সফরের প্রধান উদ্দেশ্য হবে শ্রমিকদের সমস্যা ও দাবি-দাওয়া সামনে রেখে সাড়া জাগানো বক্তব্য রাখা। এ বক্তব্য যেন শ্রমিক আন্দোলনের বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়।

৭. জনসেবা ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি শ্রমিক সমাজের মধ্যে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ও জনসেবার কাজেও শ্রমিক সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সা) নবুওয়ত পাওয়ার পূর্বেও হিলফুল ফুজুল নামক সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সমাজসংস্কার ও সংশোধন করার দায়িত্ব পালনে যারা যোগ্য তাদের সহজাতগুণই হলো সমাজসেবা। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে যাদের মন কাঁদে না এবং মানবতার সেবায় যারা এগিয়ে আসে না তাদের দ্বারা সমাজ বিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয়।

ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি শ্রমিক সমাজের মধ্যে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ও জনসেবার কাজেও শ্রমিক সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সা) নবুওয়ত পাওয়ার পূর্বেও হিলফুল ফুজুল নামক সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সমাজসংস্কার ও সংশোধন করার দায়িত্ব পালনে যারা যোগ্য তাদের সহজাতগুণই হলো সমাজসেবা। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে যাদের মন কাঁদে না এবং মানবতার সেবায় যারা এগিয়ে আসে না তাদের দ্বারা সমাজ বিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয়।

ইসলামী বিপ্লব মূলত একটি সমাজ বিপ্লব। ইসলামী সমাজ বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নায়ক মহানবী (সা)-এর সুন্নতই হচ্ছে সমাজের মানুষের সেবা করা। রাসূল (সা) বলেছেন 'খাইরুন্নাসি মাই ইয়ানফাউন্নাস' অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে মানুষের উপকার করে। অন্য হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, পথ থেকে কাঁটা সরানো, রাস্তায় গর্ত থাকলে তা ভর্তি করে দেয়া নবীজির সুন্নতের উল্লেখযোগ্য দিক। নবীর (সা) সুন্নতের অনুসরণে রাস্তাঘাট মেরামত পুল কালভার্ট তৈরি, মশক নিধন ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে মানবসেবায় ইসলামী আন্দোলনের শ্রমিক কর্মীদেরকেও সমাজ বিপ্লবের কর্মীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

অধিকন্তু নিরক্ষর শ্রমিকদের জন্য গণশিক্ষা কর্মসূচি চালু, শ্রমিকদের সন্তানদের মধ্য থেকে গরিব ছাত্রদের ফ্রি কোচিং ও বৃত্তি প্রদান, রোগীদের বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা প্রসূতিদের জন্য ধাত্রী সেবা, মাইয়্যেতের গোসল, রমজান ও ঈদসহ বিভিন্ন উপলক্ষে সহযোগিতা করা। অসহায়, বিধবা, এতিম, দুস্থ মানবতাকে সাহায্য করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণবিতরণ এবং পুনর্বাসন ইত্যাদি ব্যবস্থা করা। এসব জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ব্যক্তিগত উদ্যোগে হতে পারে। আবার কয়েকজন মিলে সামষ্টিকভাবে করতে পারে। তা ছাড়া ক্লাব সমিতি গঠন করে দারিদ্র্য বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও চিকিৎসাসেবার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে শ্রমিকদের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। সমাজকল্যাণ কার্যক্রম এবং নেতৃত্বের নিঃস্বার্থ ভূমিকার ফলে শ্রমিকদের কাছে যখন এ কথা পরিষ্কার হবে যে ইসলামী আন্দোলন শ্রমিকদের মুক্তির জন্য তখন শ্রমিকগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামী বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসবে এবং ইসলামী বিপ্লবের দাবি জানাবে।

পরিশেষে বলতে হয় ইসলামী বিপ্লব কোনো চোরাপথে বা রাতের অন্ধকারে অথবা কোন গোপন কৌশলে আসবে না। সন্ত্রাসী তৎপরতা বা বন্দুকের নলের মাধ্যমেও সত্যিকার ইসলামী বিপ্লব সম্ভব নয়। ইসলামী বিপ্লব আন্দোলনের রাজপথে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও উদ্বেলিত স্লোগানের মধ্য দিয়েই আসবে। বাংলাদেশের শ্রমিক অঙ্গন ইসলামী সমাজ বিপ্লবের একটি উর্বর ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এ অঙ্গনে শক্তিশালী জনমত গঠনের লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত শ্রমজীবী মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। সেই সাথে জনশক্তির জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মজবুত গণভিত্তি রচনা করতে হবে। যার স্বাভাবিক পরিণতিতে সমাজে ইসলামী আদর্শের বিস্তৃতি ঘটবে আর বাতিলের কবর রচিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

শ্রমিক: পৃথিবীর সকল মানুষই শ্রমজীবী। কিন্তু শ্রমিক আইনের ভাষায় যারা অর্থের বিনিময়ে গতর খাটিয়ে কাজ করে তারা হচ্ছে শ্রমিক। শ্রমিকরা সবসময় ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধভাবে থাকতে চায়। কারণ তারা যে মিল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সে মিল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক হচ্ছে ধনী শ্রেণী ও ক্ষমতাবান। তাদের মোকাবিলায় একজন শ্রমিক খুবই অসহায়। তাই তারা এই অসহায় অবস্থায় বেচেঁ থাকার জন্য কোন সংঘবদ্ধ শ্রমিক সংগঠন পেতে চায়। একজন শ্রমিক সংগঠন ব্যতীত তার মান-সম্মান, চাকরি, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য অধিকার যথাযথভাবে পাওয়ার চিন্তাই করতে পারে না। তাই একজন শ্রমিক স্বাভাবিকভাবেই কাজে যোগদান করার পর একটি শ্রমিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়।

ট্রেড ইউনিয়ন: শ্রমিক আইনের ভাষায় Trade union means union among the men of the same tread to maintain their rights. "ট্রেড ইউনিয়ন অর্থ একই পেশার শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সংগঠন করা"। শ্রমিকগণ প্রতিটি মিল-কারখানায়, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পপুঞ্জে প্রতিটি জেলা/উপজেলা/থানায় ইউনিয়ন করার অধিকার আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত। শ্রমিকদের এ সংগঠনকে আইনের ভাষায় ট্রেড ইউনিয়ন বলে, যা দেশের আইনের অধীনে রেজিস্ট্রি করে নিতে হয়।

শ্রমিক আন্দোলন: সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিয়নগুলো নিয়ে Federation গঠিত হয়। শ্রমিকদের অধিকার, দাবি-দাওয়া, মালিক ও সরকারের না-ইনসাফি ও নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে সংগ্রাম করা হয় তাকে বলে শ্রমিক আন্দোলন। আমেরিকার শিকাগো থেকে প্রকাশিত The world book encyclopedia - বলা হয়েছে। Labour movement is a term that refers to the efforts of workers as a group to improve their economic position political parties on another groups has also part played a part in the labour movement. শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের সুসংগঠিত শক্তি, যা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শ্রম আইনের ভাষায় রাজনৈতিক দলগুলো শ্রমিক আন্দোলন করতে পারে না। কিন্তু তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার জন্য শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন লালন পালন করে থাকে। তাই বাংলাদেশেও প্রত্যেক বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রমিক সংগঠন রয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব:

১. শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে কুরআনে পাকে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন: সূরা নিসার-৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ (মুমিনদেরকে তাগিদ করেছেন অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সংগ্রাম কর)।

২. সূরা কাসাসের ১-৬ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্ট করেছেন যে, পৃথিবীতে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। আমি তাদেরকে সাহায্য করতে চাই, নেতৃত্ব দিতে চাই, রাজত্ব দিতে চাই। অর্থাৎ যারাই অসহায় মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারবে সফলতা তাদের সাথেই থাকবে।

৩. বুখারী শরীফে আছে। হুজুর (সা) বলেছেন, সকল নবীই ছাগলের রাখাল ছিলেন। তাই নবীগণ নিজেদেরকে শ্রমজীবী হিসাবে মানুষের সামনে পেশ করে শ্রমজীবী মানুষ ইসলামী আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

৪. শ্রমজীবী মানুষের পরিশ্রম দেশের উৎপাদন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করে, যা জাতির সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৫. শ্রমিকগণ কাজ বন্ধ করে দিলে দেশ ও দেশের সরকার অচল হয়ে যায়।

৬. শ্রমিক শ্রেণী একটি সুশৃঙ্খল গোষ্ঠী, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই সকল কাজ করতে হয়। সে রকম একটি সুশৃঙ্খল জনগোষ্ঠী যা ইসলামী আন্দোলনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭. শ্রমিকগণ কঠোর পরিশ্রম ও সাহসী যা ইসলামী আন্দোলনের জন্য খুবই প্রয়োজন।

৮. শ্রমিকগণ তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যে কোন মুহূর্তে গড়ে তুলতে পারে, যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৯. বহু শ্রমিক এক সাথে একই মিল- কারখানায়, কলোনিতে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে। ফলে তারা যে কোনো আন্দোলনের ডাকে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বল্প সময়ে সাড়া দিতে পারে।

১০. শ্রমিকগণ শহর ও শহরতলিতে বসবাস করে, আর আন্দোলন হয় শহরভিত্তিক ফলে যে কোন আন্দোলনে সহজে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

১১. শ্রমিকগণ সবসময় সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে চায় ফলে তারা সংগ্রামী হয়ে ওঠে।

১২. শ্রমিকগণ সরকারের আচরণের ব্যাপারে সচেতন, কারণ তাদের স্বার্থ অনেকাংশে সরকারের সাথে জড়িত।

১৩. শ্রমিকগণ মালিক ও সরকারের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে সহজেই আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

১৪. পৃথিবীর যে কোন বিপ্লবে শ্রমজীবী মানুষের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে।

১৫. শ্রমিক আন্দোলন আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

১৬. দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের আন্দোলনে শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করতে চায়।

১৭. দেশের সরকার সবসময় শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলনকে ভয় পায়, কারণ শ্রমিকগণ অচল, দেশ অচল ও দেশের সরকারও অচল হয়ে পড়ে।

১৮. বাংলাদেশের শ্রমিক ময়দান দখল করে নিয়েছে সমাজতান্ত্রিক দলগুলো। রাজনৈতিক ময়দানে তাদের কোন শক্তি সামর্থ্য না থাকলেও সকল বড় বড় রাজনৈতিক দল এবং প্রত্যেক সরকার তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ শ্রমিক ময়দানে তাদের শক্তি রয়েছে। যেমন– বিগত কেয়ারটেকার সরকারের সময় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীকে তারা অকেজো করে দিয়েছিল, যার ফলে তারা কোন আন্দোলন করতে পারেনি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদেরকে তারা জামাই আদরে রেখেছে, তাদের গায়ে তারা হাত দেয়নি। কারণ তাদের নিকট মজবুত শ্রমিক সংগঠন রয়েছে। ফলে তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে বাদ দিয়ে বামপন্থীদের মূল্যায়ন করেছে শুধু শ্রমিক শক্তির কারণে।

শ্রমিক সংগঠনের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা :

১. ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে রকমের, যেভাবে চতুর্মুখী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে তার চেয়েও বেশি প্রতিবন্ধকতা শ্রমিক আন্দোলনে বাম ও সেক্যুলার দলগুলো রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামী আন্দোলনকে দখল দিতে চাইলেও শ্রমিক ময়দানে ইসলামপন্থীদের তারা কোন রকম দখল দিতে চায় না।

২. সারা বিশ্বে শ্রমিক আন্দোলন ইসলামের দুশমনদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু মুসলিম দেশগুলো বেখবর।

৩. সারা বিশ্বের সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা বিভিন্ন দেশে মজবুত শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনও গড়ে তুলেছে।

৪. সারা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা রয়েছে, বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন তাদের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৫. পৃথিবীর কোন মুসলিম দেশে ইসলামী শক্তিগুলো শ্রমিক আন্দোলন যাতে গড়ে তুলতে না পারে সে ব্যাপারে তারা সর্বদা সচেতন।

৬. আমাদের দেশেও যে সমস্ত বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ শ্রমিক সংগঠন রয়েছে তাদেরকে সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সব রকমের সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

৭. বিশেষ করে আইএলও, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সকল সুযোগ সুবিধা ইসলামবিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলো ভোগ করছে ও ব্যবহার করছে।

৮. আমাদের দেশের বিএনপির শ্রমিক সংগঠন জাতায়তাবাদী শ্রমিকদল, বামপন্থীদের নেতৃবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত।

৯. শ্রম দফতরসহ বাংলাদেশের সকল সরকারি অফিসে বামপন্থীদের প্রভাবে চলছে।

১০. এ পর্যন্ত যত সরকার বাংলাদেশে এসেছে তারা বামপন্থীদের শ্রমিক আন্দোলনকে সর্ব রকমের শক্তি জুগিয়েছেন।

১১. বিদেশের এনজিওগুলো শ্রমজীবী মানুষের আইনগত সাহায্য ও সেবা দিয়ে ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোকে সহযোগিতা করছে।

১২. বাংলাদেশে মহিলা শ্রমিক অনেক, বিশেষ করে গার্মেন্টস এ শতকরা ৯০ জন মহিলা শ্রমিক। কিন্তু তাদের মধ্যে আমাদের কোন কাজ নেই বললেই চলে।

১৩. সেক্যুলার, সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদী এনজিওগুলো শ্রমিকদের মধ্যে সেবামূলক কাজ করে তাদের মন জয় করার চেষ্টা করছে। অথচ মুসলিম দেশের এজজিওগুলো শ্রমিকদেরকে নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনাই করে না।

১৪. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এমন কোন সরকার আসেনি যারা শ্রমিক ময়দানে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনকে সহযোগিতা করেছে।

১৫. সর্বোপরি বড় সমস্যা হলো শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপারে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও নেতাগণের আগ্রহের অভাব।

সম্ভাবনা :

১. এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের সকল জনশক্তিকে শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং তাদেরকে শ্রমিক আন্দোলনের সহযোগিতার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২. ইসলামী শ্রমনীতি ব্যতীত শ্রমিকদের কোন মুক্তি নেই। এ সত্য শ্রমজীবী মানুষের কাছে যত তাড়াতাড়ি পৌছানো যাবে সফলতার সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাবে।

৩. সকল ইসলমী আন্দোলনের জনশক্তিকে আচার ব্যবহার, কথা-বার্তায় শ্রমিকবান্ধব মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে। যেমন– রাসূল (সা) বলেছেন একজন আমি ছাগলের রাখাল এবং আমার গোলাম যায়েদ আমার ভাই।

৪. শ্রমজীবী মানুষের সমস্যায় তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। যেমন- তুরস্কে ইসলামপন্থীরা শ্রমজীবী মানুষের মন জয় করেছে।

৫. মালিক শ্রেণীকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে ইসলামী শ্রমনীতি আপনাদের উন্নয়নের চাবিকাঠি এবং মালিক-শ্রমিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলে।

৬. ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত মালিক রয়েছেন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

৭. শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে বে-ইনসাফির বিরুদ্ধে এবং সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ও নেতৃত্ব দিতে হবে।

৮. এদেশের শতকরা ৯৫ জন শ্রমিক মুসলমান। তারা পরকালে বিশ্বাস করে, জান্নাতে যেতে চায়, তারা নাস্তিক নয়। তাদের মধ্যে কাজ করা সহজ। তাই বাতিলের মোকাবেলায় আমাদেরকে সকল শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

৯. আর্থিক মজবুতি অর্জন করতে হবে, যাতে অর্থের অভাবে কোন কাজ অপূর্ণ না থাকে।

১০. এদেশে যে সমস্ত বলিষ্ঠ শ্রমিক আন্দোলন চলছে, তা মজবুতীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য যেসব প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা থেকে আমাদেরকে রসদ সংগ্রহ করাতে হবে।

১১. মূল সংগঠনের প্রচেষ্টায় মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা এবং শ্রমিক সংগঠনের ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করা।

১২. দ্রুতগতিতে মহিলাদের মধ্যে কাজ শুরু ও শক্তিশালী করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং বোনদেরকে শ্রমিক ময়দানে কাজ করার জন্য মহিলা নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে।

১৩. বাংলাদেশের বাম শ্রমিক নেতৃবৃন্দ নাস্তিক হলেও এদেশের শ্রমজীবী মানুষ নাস্তিক নয়, তারা আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং পরকালে জান্নাতে যেতে চায়। তাই দাওয়াত, শ্রমিকসেবার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করার দায়িত্ব আমাদের।

১৪. শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সেবামূলক কাজ ব্যাপকভাবে করতে পারলে তাদের মন জয় করা সহজ হবে।

১৫. মুসলিম এনজিওগুলোকে শ্রমিক ময়দানে আইনি সহযোগিতা ও সেবামূলক কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

১৬. মূল সংগঠনের সকল জনশক্তি শ্রমিকদেরকে টার্গেটে নিয়ে এগিয়ে এলে আমাদের বিজয়ের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি,
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

কৃষি ও কৃষক

গোলাম রব্বানী

সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের গর্বের এই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। হাওর, নদ-নদী, খাল-বিল, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত মিলিয়ে পৃথিবীতে আমাদের দেশ এক অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি। পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, বুড়িগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র বাংলার রূপ ও পরিবেশ অকল্পনীয় হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহ পাক এ মহান নেয়ামত আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের দেশের মাটির উর্বর শক্তি জাপান ও থাইল্যান্ডের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। মাটির নিচে যেমন সম্পদ তেমনি মাটির উপরও বিশাল সম্পদে ভরপুর। আরও রয়েছে বিশাল কর্মক্ষম জনশক্তি যা পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটা অনন্য দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত মানবসভ্যতার ভিত্তি হলো কৃষি আর তার কারিগর হচ্ছে কৃষক। কৃষির সংজ্ঞা সম্পর্কে অধ্যাপক জিয়ার ম্যানের মতে, কৃষিকাজ মানুষের এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও একটি উৎপাদনমুখী কাজ। প্রকৃতির আপন নিয়মে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের জন্ম ও বৃদ্ধি, স্থায়ীভাবে বসবাস-কারী মানুষ এগুলোকে নিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়। সেই আহরণ ভূমিকেন্দ্রিক, উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডকে কৃষি উৎপাদন এমনকি পানিতে সার মিশ্রিত করে মৃত্তিকাবিহীন চাষ কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত। ওয়ার্টসন মনে করেন যে, শুধু মৃত্তিকার উপযুক্ত ব্যবহারের মধ্যেই কৃষিকাজ সীমাবদ্ধ নয়। কৃষির বৃহত্তর সীমার মধ্যে শস্য উৎপাদন এবং পশুচারণ অন্তর্ভুক্ত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ফাও (ঋঅঙ) এর মতে, মৎস্য ও বনসম্পদ আহরণও কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত (উইকিপিডিয়া)। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি ও কৃষকের উপর বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ছাড়া এদেশের উন্নয়ন অসম্ভব। এদেশে অনুকূল জলবায়ু, বিস্তৃত উর্বরভূমি ও দক্ষ কৃষকের কারণে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ধান, গম, পাট, ভুট্টা, চা, ইক্ষু, আম, আলু, মাছসহ বিভিন্ন প্রকার সবজি আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ উৎপান্ন হয়। কৃষি খাতকে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কৃষি খাতে বাজেট কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যেমন ২০১৯ সালে ২৬ হাজার দুইশত উনষাট কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা গত বছরের তুলনায় কম। ২০১৭-২০১৮ সালে কৃষিতে বরাদ্দ ছিল ৬ দশমিক ১ শতাংশ যা এ বছরে কমে ৫ দশমিক সাত শতাংশ হয়েছে। ভর্তুকির ক্ষেত্রে গত বছরে যা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল তার চেয়ে ৩ হাজার কোটি কমিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হলো কৃষি। ২০১৮ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় কৃষি মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ ভাগ জোগান দেয়। জে.ডি.পিতে অবদান ১৪ দশমিক ১০ ভাগ (কৃষি তথ্য) এতদসত্ত্বেও কৃষির উন্নয়নের জন্য কাঙ্ক্ষিত মানের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। শিল্প খাতকে যেভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে, সে তুলনায় কৃষি শিল্পকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কৃষির ও কৃষকের সমস্যা নিয়ে আমাদের দেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা হয় না বললেই চলে। নাগরিক জীবনের নানাবিধ খাদ্য সরবরাহ করে থাকে যে কৃষি ও কৃষক তারা কেন অবহেলিত? কৃষি শিল্পের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ধান, পাট, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, চা, মৎস্য মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বীজ প্রত্যয়ন কেন্দ্র প্রভৃতি কাজ করে থাকে বলে পরিষ্কার দেখতে পায়। এ জন্য সরকারের যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়, সে তুলনায় কৃষির অগ্রগতি কতটুকু তা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন সময়ের দাবি। কৃষি ও কৃষকের ওপরে ব্রিটিশ আমল থেকেই হিন্দু

জমিদাররা যে অত্যাচার চালিয়েছে তার ইতিহাস আমাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। ব্রিটিশরা কৃষিজমিতে খাদ্যদ্রব্য ফসলের পরিবর্তে নীল চাষ করিয়েছে। এটা কে না জানে? খাজনা আদায়ের জন্য জমিদাররা কৃষকদের ওপর যে নির্যাতন করত তা অবর্ণনীয়। কম মূল্য কৃষকদের উৎপাদিত ফসল জমিদারেরা ক্রয় করত আর ইংরেজদের চাহিদামত কৃষকদের ফসল উৎপাদন করতে বীজ সরবরাহ করতো আর তা ব্রিটিশ ও জমিদারের কাছে জমা হতে থাকে। কৃষকেরা হতো সর্বস্বান্ত। এই ব্রিটিশ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অধিকার আদায় করার জন্য ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ হয়েছে, তেমনি নীলচাষিদের ও তাঁতিদের বিদ্রোহ হয়েছে। এ ছাড়া রংপুরে কৃষক বিদ্রোহ, ফরাজী বিদ্রোহ, তিতুমীর বিদ্রোহ, সিরাজগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্যথা ইতিহাসের পাতায় আছে। ১৯৪৭-৪৯ সালে নাচোল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলনও হয়েছে। শেরেবাংলা ফজলুল হকের কৃষক প্রজাস্বত্ব আন্দোলনের ফলে কৃষকেরা জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। দুঃখের বিষয় সকল পেশার লোক সংগঠিত হলেও কৃষকরা অসংগঠিত, তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কোথাও কোন আন্দোলন হয়নি। বাংলাদেশে চাষী কল্যাণ সমিতি কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। এক্ষেত্রে মরহুম মাওলানা এ কে এম ইউসুফের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পন্ন হয়েছে এ বক্তৃতা মন্ত্রীদের মুখে প্রায় শুনা যায়, এ কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে এজন্য কৃষকের অবদান সবচেয়ে বেশি। যখন কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের ন্যায্যমূল্য পায় না, ১ মণ ধান বিক্রি করে ১ কেজি ইলিশ মাছ কিনতে পারে না, এক বিঘা জমির ধান কাটা ঘরে তুলা ও মাড়াইয়ের জন্য যে খরচ হয় তা ধান বিক্রি করে সে টাকা পায় না, মনের দুঃখে কৃষক যখন নিজের ধান ক্ষেতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কৃষকের যখন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তারপরেও কি কৃষি ও কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে এটা চিন্তা করা যায়। আমার বিশ্বাস কোন পাগল বললেও আরেক পাগল বিশ্বাস করবে না। ফসলি জমি কমে যাওয়া কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অন্তরায়। এক তথ্য অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, গত একদশকে প্রতি বছর ফসলি জমির পরিমাণ ৬৮ হাজার ৭০০ হেক্টর কমেছে। যা দেশের মোট ফসলি জমির শূন্য দশমিক ৭৩৮ শতাংশ। অন্য এক তথ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন ৯৬ বিঘা জলাভূমি তামাক ও চিংড়ি চাষের জন্য প্রতি বছর ২৪ হাজার বিঘা জমি কৃষিকাজের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। শহরতলি বা গ্রামে অপরিকল্পিত বাড়িঘর নির্মাণ, শিল্পকারখানা নির্মাণ, ইটভাটা তৈরি, পুকুর-দীঘি খনন, রাস্তাঘাট তৈরিসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। এ ছাড়াও দক্ষিণ অঞ্চলে ধানের জমিতে বাঁধ দিয়ে লোনা পানি প্রবেশ করিয়ে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। অপরিকল্পিত সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরা শক্তি-কমে যাচ্ছে সাথে সাথে জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। মাটির জৈব উপাদান কমে যাওয়া সঙ্গে সঙ্গে মাটির পানি ধারণক্ষমতাও থাকবে না। প্রায় ২.২৩ লক্ষ হেক্টর জমি আবাদযোগ্য হওয়ার পরও পতিত পড়ে আছে যা আবাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। এ ছাড়াও এক ফসলি জমি ২২ দশমিক ৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিকেও দুই ফসলি জমি করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে আনতে হবে। (যুগান্তর) কৃষির উন্নয়ন করতে পারলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বেকার সমস্যা সমাধান, কৃষক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। পাট, গম, ভুট্টা, আলু, ইক্ষু প্রচুর উৎপাদন হয়। পাট এক সময় সোনালি আঁশ ছিল আজ তা কেবল গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। কৃষকেরা পাট চাষ করতে আগ্রহী নয়, কারণ পাট উৎপাদন করতে যা খরচ হয় তা বিক্রি করে উৎপাদন খরচই হাতে আসে না। এমনকি পাট জাগ দেয়ার জন্য পানি পাওয়া যায় না। সরকার পাটের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিলে পাট আবার সোনালি আঁশ হতে পারে। জুট মিলগুলো যদি পাটের সামগ্রীর বাজার পায় তবেই কৃষকেরা আগ্রহী হবে। কিন্তু পাটকল শ্রমিকেরা যখন তাদের ন্যায্য দাবিতে ধর্মঘট করে তখনই আমরা আতঙ্কিত হই। এক তথ্য অনুসারে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪র্থ চাল উৎপাদক দেশ, আম, কলা, কাঁঠাল, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, মাছ উৎপাদন ৪র্থ, আলু উৎপাদন ৮ম স্থানে আছে। এ ছাড়া গম, ভুট্টাও প্রচুর উৎপাদন হয়। মুরগির খাদ্য তৈরিতে ভুট্টার প্রয়োজন বেশি। গোবর সার ব্যাবহার খুবই কম হয়, যার ফলে জমি তার শক্তি পাচ্ছে না। তাপমাত্রা উষ্ণতা রোধে তথা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্পন নেই। গবেষণা অনুসারে দেশের মোট আয়তনের ২৫% গাছ পালা থাকা দরকার। সেখানে আছে মাত্র ১০-১২%। ইউক্যালিপটাস গাছ লাগিয়ে এলাকার মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। কীটপতঙ্গ সে সব গাছে বসবে না মধুও পাওয়া যাবে না। শাকসবজি ফলমূল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে মৌসুমি যেসব ফলমূল সবজি উৎপাদন হয় তা তাড়াতাড়ি বিক্রয় করতে না পারলে পচে নষ্ট হয়ে যায়। তাই মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকের নিকট থেকে কম দামে ক্রয় করে বাজার উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে। কৃষকেরা হয় বঞ্চিত। সরকার কোটি কোটি টাকার বাজেট করে কিন্তু কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য কোন কোলেস্টোরেজ কেন করছে না তা আমাদের বোধগম্য নয়। কৃষির সাথে কৃষক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষকের মুখে হাসি ফুটলেই কৃষিব্যবস্থার মজবুত ভিত্তি হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কৃষকের সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করা এখন সময়ের দাবি। কৃষকের একটা বড় অংশের হাতে কোনো জমি নেই। অন্যের জমি বর্গা বা অন্যান্য চুক্তিতে জমি-আবাদ করে ফলে কৃষকরা উৎপাদন করেও নিজের প্রয়োজন মিটাতে অক্ষম হয়। একশ্রেণীর এনজিও কৃষকদের চড়া সুদে ঋণ দেয়। কৃষকেরা বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করে। ফসল উৎপাদন হওয়ার সাথে এনজিওরা তা চড়া সুদে আসলে শোধ করে নেয়। এ ছাড়াও ব্যাংকে কৃষকের সহজ লভ্যাংশে ঋণ পায় না। সুদমুক্ত ঋণ পেলে কৃষকেরা তাদের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে পারে। উন্নত প্রযুক্তির নামে বড় বড় ব্যবসায়ীরা সেচ, সার, কীটনাশক ঔষুধের বাজার দখল করে নেয় আর কৃষকদের নিকট তা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে ব্যবসায়ীরা লাভ করে নেয়। উন্নত প্রযুক্তির সাথে সার, কীটনাশক ঔষুধ ব্যবহার করার পদ্ধতি আমাদের অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কৃষকদের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় তা সুষ্ঠু ব্যবহার করতে না পারায় নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়। ধানচাষিদের নিকট থেকে সরকার সরাসরি ক্রয় না করে ডিলারদের মাধ্যমে ক্রয় করার কারণে কৃষকেরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে কৃষকের হাহাকার লেগেই আছে।

মৌসুমের কারণে বন্যা, ঝড়, খরার কারণে কৃষক যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সরকার কোন প্রকার সাহায্য করে না ফলে কৃষকেরা তাদের ভিটামাটি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কৃষির প্রতি যদি কৃষকের আস্থা দিন দিন কমে যায়, তবে এদেশে খাদ্যে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে। আর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হবে বিপন্ন। কৃষি শিল্পকে উন্নয়নের ভিত্তি বিবেচনায় নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা অতীব জরুরি। কৃষি ও কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে, আর উন্নয়নের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাবে। কৃষি উন্নয়নই হোক বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ও সভাপতি, বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন

দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা

লস্কর মোহাম্মদ তসলিম

(পূর্বের সংখ্যার পর)

দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের নুতন ধারা প্রবণতাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্বে পূর্বের ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনাগুলো তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। যাতে করে আমরা যারা আদর্শিক তথা ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলন সংগঠিত করতে চাই, তাদের একটু হলেও চিন্তার জগতে করণীয় ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারে। নিম্নে শুধু বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনার ঐতিহাসিক বর্ণনাই এসেছে এই জন্য যে- ঐ সময়ের ইসলামপন্থীদের এই বিষয়ে দূরদর্শী সংগঠিত কোনো চিন্তা ছিল না, যার রেশ এখনো বিদ্যমান। অধিকার আদায়ে শ্রমিক শ্রেণি জোটবদ্ধ হওয়া শুরু করলে ১৭৯৯ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত ব্রিটেন, ইউরোপে ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করেছিল। তারা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন দেশে সরকারি স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা চালায়, ফলে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, এভাবে বহু শ্রমিক সংগঠন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রমিক আন্দোলন বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রসর হয়। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা নেমেছিলেন তুমুল আন্দোলনে। তাদের দাবি ছিল, উপযুক্ত মজুরি এবং দৈনিক আট ঘন্টার বেশি কাজ নয়। মে মাসের প্রথম দিনেই শ্রমিকরা ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। প্রায় তিন লাখ শ্রমিক যোগ দেয় সেই সমাবেশে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের রুখতে মিছিলে পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। বহু শ্রমিক হতাহত হন। পরে আন্দোলনে অংশ নেয়ার অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় গ্রেফতারকৃত ছয় শ্রমিককে। কারাগারে বন্দিদশায় এক শ্রমিক নেতা আত্মহত্যাও

"১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা নেমেছিলেন তুমুল আন্দোলনে। তাদের দাবি ছিল, উপযুক্ত মজুরি এবং দৈনিক আট ঘন্টার বেশি কাজ নয়। মে মাসের প্রথম দিনেই শ্রমিকরা ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। প্রায় তিন লাখ শ্রমিক যোগ দেয় সেই সমাবেশে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের রুখতে মিছিলে পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। বহু শ্রমিক হতাহত হন।"

করেন। পরের বছর প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে, দিনটিকে মে দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বর্তমানে মে মাসের প্রথম দিনটিকে পুরো পৃথিবীতে পালন করা হয় 'শ্রমিক দিবস' হিসেবে। পৃথিবীর সব শ্রমিকের লড়াই-সংগ্রাম-পরিশ্রমের প্রতি সম্মান জানানো হয় এই দিনে, শ্রদ্ধা জানানো হয় তাদের আত্মত্যাগের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। অ্যামেরিকা স্বাধীন হওয়ার আগে শ্রমজীবী মানুষের প্রথম সংগঠন গড়ে ওঠে ১৬৮৪ সালে। ঠেলাগাড়ির চালকরা প্রথম ঠেলা শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। ১৮৪২ সালে আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণি ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট করার অধিকার পায়। বিশ্বের প্রথম নারীশ্রমিকদের ধর্মঘট পালিত হয় আমেরিকায় ১৮২৩ সালে। বিশ্বের শিল্প-কারখানাগুলোয় শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় ১৮২৮ সালে। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণি নিজ নিজ দেশে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলে। ১৮৬৪ সালে মার্কস-অ্যাঙ্গেলসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি। ইতিহাসে এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংগঠন নামে খ্যাত। ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ প্যারিসের শ্রমিকরা শহর থেকে বুর্জোয়া শাসকদের হটিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নেয়। দশ দিন পরে ২৮ মার্চ তারিখে শ্রমিকরা গঠন করেছিল পৃথিবীর প্রথম প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্র প্যারিস কমিউন।

অক্টোবর বিপ্লবঃ অক্টোবর বিপ্লবকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত অঞ্চলগুলোয় বলা হয় 'মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ায় বলশেভিকরা

ক্ষমতা দখল করে, শুরু হয় 'লাল' আর 'সাদা'-দের মধ্যে গৃহযুদ্ধ। অক্টোবর বিপবের বিজয় রাশিয়াকে রাজনৈতিকভাবে একটি অগ্রসর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল।

পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে মুক্তি: এই বিপ্লব জনগণকে পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিল? এই বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণি ও মেহনতি কৃষকের জন্য শুধু সামাজিক মুক্তিই আনেনি, রাশিয়ার গণতান্ত্রিক সমস্যাগুলোও সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল।

লেনিন ১৯২৪ সালে পরলোকগমন করেন, কিন্তু রুশ বিপ্লব, সোভিয়েত রাশিয়া বা কমিউনিজম, এ সবের সঙ্গে তার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তেভাগা আন্দোলন: ১৯৩০ সালে বাংলার কয়েকটি জেলায় কৃষকরা তেভাগার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল, ভাগচাষিকে ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দিতে হবে।

এই আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণ বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান ও নমঃশূদ্র চাষিদের অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলনে জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজদের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করতে হয়েছিল কৃষকদের? ১৯৪৬ সালেও আর এক দফা আন্দোলন হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা: দক্ষিণ আফ্রিকার খনি শ্রমিকদের ওপর নানা নির্যাতন, মজুরি বৃদ্ধি, থাকা-খাওয়া ও জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ১৯৪৬ সালে ৭০ হাজার শ্রমিকের অংশগ্রহণে ধর্মঘট পালিত হয় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। এএনসি এই আন্দোলনে যোগদানের বিষয়ে নীরব থাকলেও ম্যান্ডেলা পরিচিত কয়েকজনকে নিয়ে কমিউনিস্ট নেতা জেবি মার্কসের সঙ্গে দেখা করে এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

জার্মানির শ্রমিক আন্দোলন: ১৯৫৩ সালের ১৭ জুন তৎকালীন পূর্ব জার্মানির সরকারের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল শ্রমিকসহ সাধারণ জনগণ। বড় কোম্পানিগুলো জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পূর্ব জার্মান সরকার, যার প্রতিবাদে ১৬ জুন থেকে আন্দোলন শুরু করেছিল কয়েক শ' শ্রমিক। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে প্রায় ৭০০ শহরে। ১৭ জুন আন্দোলন থেকে সরকারের পদত্যাগ, স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠান ও দুই জার্মানির একত্রীকরণের দাবি ওঠে। সেনাদের গুলিতে নিহত হয় ৫০ জন। শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল ইউরোপ, স্পেন ও পর্তুগালে ২০১২ সালের ১৪ নভেম্বর বুধবার পালিত হয়েছিল সাধারণ ধর্মঘট। কর্মবিরতি পালন করেছিলেন গ্রিস ও ইতালির শ্রমিকরা। এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানায় বেলজিয়াম, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ডসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো। এতে বিভিন্ন দেশের শিল্প-কারখানা অচল হয়ে পড়ে। বাতিল হয় ইউরোপের অনেক ফ্লাইট। চার দেশে একযোগে ধর্মঘট পালনের ঘটনা ইউরোপে এটিই প্রথম। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ফ্রান্সে সর্ববৃহৎ শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা গিয়েছে ২০১৬ সালে। শ্রম আইন সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে অসন্তোষের জের ধরে জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার (সিজিটি) ইউনিয়নের ডাকে ধর্মঘটে ফ্রান্সের প্রায় সব বিভাগের শ্রমিকরাই অংশ নিয়েছিলেন। এ ধর্মঘটের একপর্যায়ে প্রায় ৩৫ লাখ শ্রমিক রাস্তায় নেমে আসেন। তাদের সঙ্গে শামিল হয় ছাত্র ও তরুণরা। সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল ১৯৮২ সালের ১৯শে জানুয়ারি সেই ধর্মঘট ছিল বৃহৎ, ঐতিহাসিক এবং সবদিক দিয়ে সফল। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় সর্বাত্মক বনধ (হরতাল) পালিত হয়েছিল। ভারতে শ্রমিক বিক্ষোভ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম মাসিক মজুরি ১৮ হাজার রুপি করা এবং শিল্প-কারখানার বেসরকারীকরণ ঠেকানোসহ ১৪ দফা দাবিতে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট পালন করেন সেবা খাতের লাখ লাখ শ্রমিক। ১৫ কোটির বেশি শ্রমিক এ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন বলে সংগঠনগুলোর দাবি। উক্ত ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলন থেকে আমাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় মেসেজ নিতে চেষ্টা করতে হবে।

'অধিকার আদায়ে আদর্শ/ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম জোরদার করতে হবে'

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শ্রমিকেরা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করছেন, মালিকের আকাশচুম্বী স্বপ্নকে নির্মাণ করছেন, সেই শ্রমিকদেরকে পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে শ্রমিকরা নানা নির্যাতন ও অধিকার বঞ্চিত ছিল। এখনও অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। শ্রমিকদের উপর হাজার বছর ধরে চলে আসা লাঞ্ছনার অধ্যায়ের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেছিল রাসূল (সা) এর হাতে। মানবতার পরম বন্ধু নবী (সা) শ্রমিক নির্যাতনকারীর লাঠিকে থামিয়ে দিয়েছেন কঠোর হস্তে। ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণেও বাদ যায়নি শ্রমিকদের কথা।

ইসলামই একমাত্র মানবজাতিকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখায়। ইসলাম সমাজের মেহনতি শ্রমিকদের দিয়েছে বিশেষ মর্যাদা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নির্যাতিত-নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণির অধিকার ও সার্বিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি ইসলামই উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজে ইসলামী শ্রমব্যবস্থা চালু হলে মালিক ও শ্রমিক উভয় শ্রেণিই সমান উপকৃত হবে। তাই শ্রমিক সমাজসহ বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকেও ইসলামী আদর্শের দিকেই ফিরে আসতে ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও মজবুত করতে হবে। আমরা যারা আদর্শিক তথা ইসলামী আন্দোলন করি তাদের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়াতে হবে, আদর্শিক নেতৃত্বের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করতে চেষ্টা করতে হবে।

অন্যথায় ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সুবিধাবাদী কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদীরা গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি নামে, ধর্মবিশ্বাসী মজলুম শ্রমিকদের সংগঠিত করে, শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতে থাকবে। আদর্শিক ট্রেড ইউনিয়ন তথা ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনকে আরো সক্রিয়, কৌশলী নীতিতে এগোতে হবে, ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের যথাযথ চিত্র শ্রমিকসমাজের নিকট তুলে ধরতে হবে। যেভাবে মিসর আলজেরিয়ায় তিউনিসিয়া তুরস্কে আদর্শিক তথা ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলন মজবুত করতে না পারলে যে কোন বিজয়ের ফল ধরে রাখা যায় না। ১৯৫৪ সালে মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতৃত্বে একটা বিজয় এসেছিল, কিন্তু বানোয়াট শ্রমিক ধর্মঘটের কারণে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইখওয়ানের যদি শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন থাকতো তাহলে ইতিহাস ভিন্ন হতো, ঠিক তদ্রূপ শহীদ মুরসির বিজয়ের পরে চক্রান্তের মোকাবিলায় শত শত উচ্চশিক্ষিত ডক্টরেট ডিগ্রিধারী লোক জীবন দেয়ার পরও সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। ইসলামপন্থীরা সংগঠিত হই, সময়োপযোগী কর্মকৌশল প্রস্তুত করি, সকলে মিলে বিভিন্ন পেশার শ্রমিক ভাইবোনদের কাছে যাই, তাদের সমস্যাদি জানতে চেষ্টা করি, সম্ভাব্য শ্রমিকসেবা দিতে চেষ্টা করি, সমাধানের জন্য সংগঠিত করতে পেশাভিত্তিক ডিফরম পূরণ করাতে চেষ্টা করি, যত পেশা তত ট্রেড ইউনিয়ন করে, ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে সকল শ্রমিককে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করি। (সমাপ্ত)

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সড়ক দুর্ঘটনা ও ঈদযাত্রা

কবির আহমদ

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এইবার ঈদুল আজহার সময়ে ঈদ উদযাপনে বাড়ি যাওয়া-আসার সময়ে সড়কপথে ২০৩টি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে যাত্রীসাধারণ। এইসব দুর্ঘটনায় ২২৪ জন নিহত হয়েছেন ও আহত হয়েছেন ৮৬৬ জন। অপর দিকে সড়ক রেল ও নৌপথে সব মিলিয়ে ২৪৪টি দুর্ঘটনায় ২৫৩ জন নিহত ও ৯০৮ জন আহত হয়েছেন। সড়কপথে এই বিরাট লাশের মিছিল জনগণ আর কত দেখবে এবং চোখের জল ফেলবে? এর প্রতিকার দরকার, বিআরটিএ কি কোন পদক্ষেপ নিবেন, না কি দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন তা নিয়ে জাতির কাছে বিরাট প্রশ্ন। ঈদযাত্রা শুরু (৬ আগস্ট) থেকে ঈদ শেষে বাড়ি থেকে কর্মস্থলে ফেরা পর্যন্ত বিগত ১২ দিনের দুর্ঘটনায় প্রাণহানির এই হিসাব। ঈদ মুসলমানদের প্রধান উৎসব। জনগণের ইচ্ছা থাকে সারা বছর কর্মব্যস্ততা ও যান্ত্রিক জীবনের কিছুটা অবসান করে পরিবারের সকলে এক সাথে ঈদ উদযাপনের মাধ্যমে ঈদের খুশি বা আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়া। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় ঈদের খুশিকে ম্লান করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সমাজে ও রাষ্ট্রে এই দুর্ঘটনাময় অনেকে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আদরের সন্তান হারিয়েছে তাদের ঈদের আনন্দতো দূরের কথা শোকে পাথর হয়ে গেছে। অনেক পরিবার তার একমাত্র কর্মক্ষম লোককে হারিয়ে দিশেহারা। এমন পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে যারা তাদের কর্মক্ষম বা আয় রোজগারের একমাত্র ব্যক্তিকে হারিয়ে গ্রামেই যেতে হয়েছে। শহরে জীবন যাপন করার তাদের আর কোনো অবলম্বন থাকবে না।

এই দুর্ঘটনা ও নিহতের ঘটনা ছাড়াও এবার ঈদে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, যানজটের ভোগান্তি, শিডিউল বিপর্যয়, টিকেট কালোবাজারি, ফেরি পারাপারে ভোগান্তিসহ নানা কারণে যাত্রী হয়রানি বেড়েছে। বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চালানো, ফিটনেসবিহীন যানবাহন ও পণ্যবাহী যানবাহনে যাত্রী বহন, পণ্যবাহী যানবাহন বন্ধের নিষেধাজ্ঞা অমান্য, অদক্ষ চালক ও হেলপার দিয়ে যানবাহন চালানো, মহাসড়কে সিএসজিচালিত অটো রিকশা, ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক, নসিমন করিমন ও মোটরসাইকেল দূরপথে চলাচল, সড়ক মহাসড়কে ফুটপাথে বা ঢাকা যাতায়াতে মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকা বা মনিটরিং স্থিতিশীলতা দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

দুর্ঘটনা রোধে করণীয়: নতুন চালকের কর্মক্ষম লাইসেন্স ইস্যু পদ্ধতি আধুনিকায়ন, ফিটনেস জটিলতা দেয়ার পদ্ধতি আধুনিকায়ন রাস্তায় ফুটপাথ-আন্ডার পাস ওভার পাস নির্মাণ, জেব্রাক্রসিং অঞ্চল দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান ও ওভারটেক ডিজিটাল ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ সড়ক নিরাপত্তায় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলকে সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিরোধে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা। চালকের প্রশিক্ষণের জন্য সরাকরি-বেসরকারিভাবে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ, ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া ও নৈরাজ্য বন্ধ, মহাসড়কে গতি নিরাপদ করা, ধীরগতি ও দ্রুতগতির জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা, যানবাহন যাত্রার আগে ত্রুটি পরীক্ষা ও মেরামত করা।

এ ছাড়াও আরো উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ আলোচনা করা হলো–
দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা আগে জরুরি এবং তা চালক-যাত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে। সিগন্যালিং বা ট্রাফিকব্যবস্থা আধুনিকায়নের বিকল্প নেই। ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার কমানোর পরিকল্পনা প্রয়োজন। রোড-সংকেত সম্পর্কে চালক-যাত্রীর পরিষ্কার ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে চালক-সহকারীদের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একমুখী রাস্তা চালু করা যেতে পারে। পথচারীদের অবশ্যই ওভারব্রিজ বা পাতালপথ ব্যবহার করতে হবে। ফিটনেসবিহীন গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না। দূরপালার গাড়িচালকদের বাধ্যগতভাবে পরপর ট্রিপ না দিয়ে পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। গাড়ি চালানোর সময় চালকদের অবশ্যই মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে যাত্রীরাও সচেতন হয়ে এ ভয়াবহ প্রবণতা রুখে দিতে পারে। রাস্তা প্রশস্ত করতে হবে। এটা সময় বা অর্থসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় বা মোড়ে রাস্তা প্রশস্ত করা যেতে পারে। দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আরো আন্তরিকতা দেখাতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে আইনের যথার্থ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না! শুধু আইন করে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব নয়। সর্বাগ্রে সচেতনতা জরুরি আর ক্ষেত্রবিশেষ সংশিষ্টদের বিবেক জাগ্রত হওয়া দরকার। সরকার-জনগণ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ও সভাপতি, বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন

শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে প্যারালিগ্যাল কর্মীর ভূমিকা

আতিকুর রহমান

অধিকার কী? অধিকার একটি বহুল উচ্চারিত শব্দ। সাধারণভাবে অধিকার বলতে আমরা অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের কাছে স্বীকৃত ও আইনানুগ প্রাপ্যকে ঐ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের অধিকার বলতে বুঝি।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। প্রতিটি মানুষ চায় তার অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে।

শ্রমিক অধিকার কী? শ্রমিক অধিকার বলতে আমরা রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকারীর নিকট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঘোষণা ও আইন দ্বারা স্বীকৃত শ্রমিকের প্রাপ্য/প্রাপ্যসমূহকে বুঝি।

শ্রমিক অধিকার উৎস: শ্রমিক অধিকারের কতিপয় উৎস রয়েছে। যেমন, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৩ ও ২৪ ধারায়, বাংলাদেশ স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কনভেনশনসমূহ বিশেষ করে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ও দরকষাকষির অধিকারবিষয়ক আইএলও কনভেনশনের ৮৭ ও ৯৮ ধারায়, আইএলওর আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৪, ১৫, ২০, ৩৪, ৩৭, ৩৮ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও সংশোধনী ২০১৩, শ্রমনীতি ও শ্রম বিধিমালায়, সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক চাকরিবিধিতে, কোন প্রতিষ্ঠানের সিবিএর সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামায়, শ্রমইস্যুতে উচ্চ আদালত প্রদত্ত বিভিন্ন সময়ের রায়, পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা ইত্যাদির শ্রমিক অধিকারের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। এসবই মূলত শ্রমিক অধিকারের উৎস।

শ্রমিক অধিকারের ধরন: (নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে) ১. ন্যায্য মজুরি ২. উপযুক্ত ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ৩. নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ৪. ছুটি ৫. জবরদস্তিমূলক শ্রম হতে রক্ষা ৬. উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ৭. নিয়োগ ও পরিচয়পত্র পাবার অধিকার ৮. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ৯. সংগঠিত হওয়া ও সংগঠন করার অধিকার ১০. যৌথ দরকষাকষির অধিকার।

নারীশ্রমিকদের বিশেষ কিছু অধিকার: ১. সম ও ন্যায্য মজুরি ২. সম আচরণ ৩. কর্ম ও নিয়োগে সমতা ৪. পৃথক বাথরুম/প্রক্ষালন /ভোজন কক্ষ ৫. মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও সবেতন ছুটি ৬. শিশু যত্নাগার ৭. অতিরিক্ত ভার বহন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ না করা ৮. নৈশকালীন কাজে যুক্ত না হওয়া ৯. ভূ-গর্ভে কাজে নিযুক্ত না হওয়া ১০. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইনগত ব্যবস্থা।

শ্রমিক অধিকার লংঘনের সাধারণ ক্ষেত্রসমূহ : শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারের অন্যতম মৌল ভিত্তি হচ্ছে শ্রম আইন। শ্রমজীবী মানুষের ওপর যাবতীয় শোষণ-বঞ্চনা, অন্যায় ও নির্যাতন প্রতিরোধে শ্রম আইন ঢাল হিসেবে কাজ করে। শ্রমিকের অধিকার ও প্রাপ্যসমূহ রক্ষায় এবং জীবনমান উন্নয়নে শ্রম আইন বিশেষ ভূমিকা রাখে। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশে অর্ধশতাধিক আইন শ্রমিকদের জন্য কার্যকর ছিল। শ্রমিকরা একাধিক আইনের নানাবিধ ব্যাখ্যায় অসহায় বোধ করত বলে শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে একটি একক শ্রম আইনের দাবি ওঠে। ১৯৯২ সালে শ্রম আইন কমিশন গঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে এ কমিশন একটি খসড়া প্রতিবেদন পেশ করে যা পরবর্তীতে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ হিসাবে সংসদে অনুমোদিত হয়। এটি পরবর্তীতে ২০১৩ সালে বিধিমালা জারির মধ্য দিয়ে সংশোধিত রূপ লাভ করে। শ্রম আইন যথাযভাবে সরকার-মালিক-শ্রমিক কর্তৃক অনুসৃত না হবার প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশেষত শ্রম আইনে শ্রমিকদের যেসব অধিকার দেয়া আছে তা পালন না করার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শ্রম আইন লংঘন করা

হচ্ছে। শ্রম-আইন লংঘনের সাধারণ ক্ষেত্রসমূহ হলো :

ন্যায্য মজুরির ক্ষেত্রে:

- ধারা ১২১ মজুরি পরিশোধের দায়িত্ব
- ধারা ১২২ মজুরিকাল স্থিতিকরণ
- ধারা ১২৩ মজুরি পরিশোধের সময়
- উপযুক্ত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ (শ্রম আইনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার ক্ষেত্রে:

- ধারা ১০০ দৈনিক কর্মঘন্টা
- ধারা ১০১ বিশ্রাম বা আহারের বিরতি
- ধারা ১০২ সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা
- ধারা ১০৮ অধিকাল কর্মের জন্য অতিরিক্ত ভাতা

ছুটির ক্ষেত্রে:

- ধারা ১০৩ (ক) সাপ্তাহিক ছুটি
- ধারা ১১৫ নৈমিত্তিক ছুটি
- ধারা ১১৬ পীড়া ছুটি। এ ছাড়াও

উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দেয়া
নিয়োগ ও পরিচয়পত্র না দেয়া
সংগঠিত হবার সুযোগ না দেয়া
দরকষাকষির অধিকার হতে শ্রমিককে বঞ্চিত করার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার লংঘিত হয়।

নারীশ্রমিকদের ক্ষেত্রে সাধারণত যে সকল অধিকার লংঘিত হতে দেখা যায় তা হলো–
সমকাজে সমমজুরি না দেয়া
তাদের সাথে পুরুষ শ্রমিকদের ন্যায্য সম ও ন্যায়সঙ্গত মানবিক আচরণ না করা
সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেয়া
ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নারীশ্রমিকদের নিযুক্ত করা
নারীশ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে পৃথক বাথরুম/প্রক্ষালন কক্ষ/ভোজন কক্ষ না থাকা
কর্মক্ষেত্রে শিশু যত্নাগার না থাকা ইত্যাদি
এ ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে আরো নানাভাবে শ্রম আইন লংঘিত হতে দেখা যায়।

প্যারালিগ্যাল কর্মীর পরিচয়: একজন প্যারালিগ্যাল কর্মী বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি শ্রম আইন ও শ্রমিক অধিকার ইস্যুতে বিশেষভাবে অবহিত, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত। প্যারালিগ্যাল কর্মী সেই ব্যক্তি যিনি শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্য ও আইন-স্বীকৃত অধিকারাদির বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত এবং শ্রমিকের অধিকার লংঘনে করণীয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তিনি অধিকারবঞ্চিত শ্রমিককে সঠিক পরামর্শ ও স্বতন্ত্রভাবে আইনি সহায়তা ও দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম। একজন প্যারালিগ্যাল কর্মী আইনজীবীর বিকল্প নন, কিন্তু তিনি ভুক্তভোগী বা অধিকারবঞ্চিত শ্রমিকদের পক্ষে ভূমিকা পালনকারী ও সহায়ক ব্যক্তি বিশেষ।

একজন প্যারালিগ্যাল কর্মীর রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভুক্তভোগী বা সহায়তাপ্রার্থী শ্রমিক থেকে শুরু করে শ্রম আদালতের আইনজীবী, অভিজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে শ্রমিক-স্বার্থের স্বপক্ষে, আইনি তথা ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় ও নিশ্চতকরণে প্যারালিগ্যাল কর্মীকে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে কাজ করতে হয়।

প্যারালিগ্যাল কর্মীর কাজ: একজন প্যারালিগ্যাল কর্মীর রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভুক্তভোগী বা সহায়তাপ্রার্থী শ্রমিক থেকে শুরু করে শ্রম আদালতের আইনজীবী, অভিজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে শ্রমিক-স্বার্থের স্বপক্ষে, আইনি তথা ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় ও নিশ্চতকরণে প্যারালিগ্যাল কর্মীকে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে কাজ করতে হয়। একজন

প্যারালিগ্যাল কর্মীর কাজগুলো নিম্নরূপ : ১. তথ্য সহায়তা প্রদান ২. আইনি পরামর্শ প্রদান ৩. তথ্য সংগ্রহ ৪. অভিযোগ সাজানো ৫.আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ ৬. অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা ৭. ভুক্তভোগী শ্রমিককে আশ্বস্ত করা ৮. শ্রম আদালত/বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ ৯. দরখাস্ত লেখা ১০.কৈফিয়তের জবাব দেয়া। উপরোক্ত কার্যক্রম সুসম্পন্ন করতে একজন প্যারালিগ্যাল কর্মীকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্যারালিগ্যাল কর্মীর যোগ্যতা: একজন প্যারালিগ্যাল কর্মীর কতিপয় যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকা বাঞ্ছনীয়। প্যারালিগ্যাল কর্মীকে হতে হবে– ১. ধৈর্যশীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও মিষ্টভাষী ২. শ্রম, পারিবারিক ও ফৌজদারি আইন সম্পর্কে জ্ঞাত ৩. তথ্য বিনিময় ও যোগাযোগ দক্ষতা সম্পন্ন ৪. কম্পিউটার ই-মেইল ব্যবহারে সক্ষম ৫. দরখাস্ত/খসড়া প্রস্তুতিতে দক্ষতাসম্পন্ন ৬. শ্রমিক আন্দোলন এর সাথে যুক্ত ৭. শ্রমিক অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল ৮. নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণে পারদর্শী ৯. আন্তরিক ও কর্মতৎপর।

প্যারালিগ্যাল কর্মীর সাথে যে সকল উপকরণ থাকতে হবে: একজন প্যারালিগ্যাল কর্মীর সাথে সার্বক্ষণিকভাবে তার কাজের সুবিধার্থে নিম্নলিখিত কতিপয় উপকরণসমূহ থাকা অত্যাবশ্যক। যেমন– ১. নিবন্ধন খাতা ২. শ্রমআইন, শ্রম বিধিমালা, আদালতের রায়ের কপি ৩. রেকর্ডিং যন্ত্র, মোবাইল ও কম্পিউটার ৪. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সংস্থার ফোন নাম্বার ৫.তথ্য-সংগ্রহের ফরম্যাট ৬. শ্রম আইন/বিধি সংক্রান্ত ফর্ম ৭.তথ্য-ডিরেক্টরি ৮. প্যারালিগ্যাল কার্যক্রম সহায়িকা ৯. শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কাগজপত্র।

প্যারালিগ্যাল কর্মীর করণীয়: কোথায় ও কিভাবে শ্রমিক অধিকার লংঘিত হচ্ছে সে

ব্যাপারে সজাগ থাকা ও তথ্য সংগ্রহ।

- শ্রমিকদের অধিকার ও আইনের বিষয়ে অবহিতকরণ।
- প্যারালিগ্যাল কার্যক্রম সম্পর্কে অন্যকে জানানো কিংবা প্রচার করা।
- কোনটি মামলা করা উচিত, কোনটি করা উচিত নয় সে সম্পর্কে শ্রমিককে তথ্য-পরামর্শ প্রদান।
- অভিযোগের শ্রেণিবিন্যাস ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ভুক্তভোগী শ্রমিকদের সঠিক-দিকনির্দেশনা প্রদান।
- শ্রমিকদের আইনবিষয়ক তথ্যগত অজ্ঞতা দূরীকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি।

প্যারালিগ্যাল কর্মীর বর্জনীয়: প্যারালিগ্যাল কার্যক্রম পরিচালনাকালে ভুক্তভোগী শ্রমিকের নিকট হতে কোন অর্থ গ্রহণ না করা। অনৈতিক কাজে যুক্ত না থাকা। শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী কোন কিছু না করা। যথাযথ/ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত স্বপ্রণোদিত হয়ে একক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা।

প্যারালিগ্যাল কর্মীর মূল দায়িত্ব: একজন প্যারালিগ্যাল কর্মী শ্রমিকদের আইন-সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। তার কাছে কোন শ্রমিক আইন সহায়তার জন্য এলে, প্যারালিগ্যাল তাকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা বা পরামর্শ প্রদান করবেন। যেক্ষেত্রে প্যারালিগ্যাল সহায়তা বা পরামর্শ প্রদান করতে সক্ষম হবেন না, সেক্ষেত্রে প্যারালিগ্যাল বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করবেন। যে সকল বিষয়ে শ্রমিক প্যারালিগ্যাল কর্মীর সহায়তা চাইতে পারে তা হলো-

ব্যক্তিগত বিষয়াদি: ১. মালিকের নিকট বকেয়া পাওনা আদায় ২. চাকরি হতে অপসারণ ৩. অপসারণের পর পাওনা পরিশোধ না করা ৪. প্রসূতি কল্যাণসুবিধা প্রদান না করা ৫. অশোভন আচরণের শিকার হওয়া ৬. ছুটি না পাওয়া।

যৌথ বিষয়াদি: ১. মজুরি পরিশোধ বিলম্ব ২. কারখানা স্থানান্তরিত হওয়া ৩. কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা।

ইউনিয়নের বিষয়াদি: ১. ইউনিয়ন গঠন সংক্রান্ত ২. ইউনিয়ন গঠনে মালিকের বাধা ও অসৎ শ্রম-আচরণ ৩. ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের হয়রানি ও চাকরিচ্যুত ৪. ইউনিয়ন পরিচালনা ৫. দাবিনামা পেশ ও যৌথ দরকষাকষি।

একজন প্যারালিগ্যাল কিভাবে শ্রমিককে সহায়তা দিতে পারে-

একজন প্যারালিগ্যাল কর্মী শ্রমিকদের আইন-সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। তার কাছে কোন শ্রমিক আইন সহায়তার জন্য এলে, প্যারালিগ্যাল তাকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা বা পরামর্শ প্রদান করবেন। যেক্ষেত্রে প্যারালিগ্যাল সহায়তা বা পরামর্শ প্রদান করতে সক্ষম হবেন না, সেক্ষেত্রে প্যারালিগ্যাল বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করবেন।

১. নির্ধারিত ফরমে শ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ
২. কিভাবে সহায়তা করা যায় তা নির্ধারণ
৩. শ্রমিককে পরামর্শ প্রদান
৪. শ্রম-পরিচালক বা শ্রম পরিদর্শককে পত্র প্রদান
৫. রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র তৈরিতে সহায়তা
৬. দরখাস্ত তৈরিতে সহায়তা
৭. আইনজীবী/আদালতের দ্বারস্থ হওয়া।

অভিযোগ গ্রহণ ও পদ্ধতি : অভিযোগ গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। একজন প্যারালিগ্যাল কর্মী তার নিকট সাহায্য চাইতে আসা শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা অভিযোগসমূহ যথাযথভাবে অবহিত হবেন। প্রয়োজন একটি সাদা কাগজে বা নিজ উদ্যোগে তৈরি/ছাপানো ফরম্যাটে শ্রমিকের অভিযোগটি তিনি লিপিবদ্ধ করবেন। অভিযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য যাচাই-বাছাই, তথ্যের সঠিকতা নিরূপণ এবং অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অভিযোগের ধরন নানা রকমের হতে পারে। ধরনের ওপর নির্ভর করবে কোন ধরনের প্যারালিগ্যাল সহায়তা ঐ শ্রমিককে দেয়া যায় তা অভিযোগ গ্রহণের সময় খেয়াল রাখতে হবে।

প্রথমত: ধৈর্য ধরে প্যারালিগ্যালকর্মী শ্রমিকের অভিযোগটি শুনবে।

তিনি ঘটনার ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

শ্রমিকের নাম, বয়স, পদবি, প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা কার্যকালের মেয়াদ যথাযথভাবে লিখে রাখবেন।

ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ যেন নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয় তা লক্ষ্য রাখবেন।

অভিযোগের সাথে সম্পৃক্ত কাগজ/পত্রাদি (ডকুমেন্টস) সংগ্রহে রাখবেন।

শ্রমিকের পরিচয়পত্রের (যদি থাকে) একটি ফটোকপি অভিযোগের সাথে সংযুক্ত করবেন।

প্রয়োজনে ভয়েস রেকর্ডিং যন্ত্র ব্যবহার করবেন।

প্যারালিগ্যালকর্মী ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে তৎপর/উদ্যোগী হবেন।

সহায়তা প্রার্থী শ্রমিকের ফোন/যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কে অবহিত থাকবেন।

অভিযোগ গ্রহণ পরবর্তী সম্ভাব্য পদক্ষেপ/করণীয় সম্পর্কে তিনি শ্রমিককে অবহিত করবেন।

গৃহীত অভিযোগটির বিষয়ে সম্ভব হলে তিনি তাৎক্ষণিক পরামর্শ দেবেন বা আইনজীবীর সহায়তা নেবেন।

পরিশেষে বলা যায় ভুক্তভোগী শ্রমিককে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একজন প্যারালিগ্যাল কর্মীর ভূমিকা অনেক। শ্রমিকের অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শোনা, লিপিবদ্ধ করা, তাকে পরামর্শ দেয়া, প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি তৈরি, সংরক্ষণ, সরবরাহ, প্রয়োজনে মামলার প্রস্তুতি, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, আইনজীবী, শ্রম দফতর, শ্রম আদালত ইত্যাদির সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে প্যারালিগ্যাল কার্যক্রম। একজন অসহায়, ভুক্তভোগী ও সাহায্যপ্রার্থী সাধারণ শ্রমিকের নিতান্ত সহযোগী ও আইনি পথপ্রদর্শক হিসেবে তার ভূমিকা ব্যাপক ও অনস্বীকার্য।

লেখক : কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

পরিবহন শ্রমিকদের যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত

খান মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী

রসিকতা হলেও কথাগুলো শিক্ষণীয়। যেমন একটি অফিসের দারোয়ান বলেছিলো, আমার ক্ষমতা দেখেছেন কী? আমি দরজা খুলে না দিলে সাহেব অফিসে ঢুকতেই পারেন না। পিয়ন বলেছিলো, আমরা টেবিল মুছে না দিলে সাহেব বসতেই পারেন না। সাহেবের গাড়ির ড্রাইভার যদি বলতো, আমি গাড়ি না চালালে সাহেব তো অফিসে যেতে পারবেন না। শিক্ষিত ও বড় মাপের কর্মকর্তা যদি অফিসে না যান তাহলে তার কাজটা অন্য একজনে চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ড্রাইভার না এলে কেমন হয়? দেশের সকল অফিস, আদালত, ব্যবসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি হাসপাতালও যদি কয়দিন বন্ধ থাকে তাতে যতটুকু জনদুর্ভোগ হয় তার হাজার গুণ হয় যদি পরিবহন বন্ধ থাকে। মানুষ যেমন পরিবহন শ্রমিক বা মালিকদের নিকট বন্দী আবার পণ্যবাহী পরিবহন বন্ধ থাকলে দুইদিনের মধ্যে ৪০ টাকার কাঁচা মরিচ একেবারে ১৪০ টাকায় উন্নীত হয়। এখানেই শেষ নয়, একজন অসুস্থ রোগীকে বড় ডাক্তারের নিকট নিয়ে তার পরিবারের লোকেরা যে কতবার ডাক্তার সাহেবকে বাবা ডাকেন। ডাক্তার সাহেব আপনি আমার ছেলেকে বাঁচান যত টাকা লাগবে আমি দিবো। ডাক্তারের অবহেলার জন্য যেমন রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে আবার একজন বাসচালকের অবহেলার জন্য ৫০ জন জীবন্ত মানুষ মৃত্যুর মুখে পড়তে পারে। এখন মহান দায়িত্বে যে গাড়িচালকের হাতে যার একটু অবহেলার দরুন ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। সে বাস চালককে কবে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, বাবা সুন্দরভাবে সচেতনভাবে বাস চালাও যেহেতু তুমি পুরো রাত নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে নিরাপদে আমাদেরকে গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছো। সারারাত যে যাত্রী বাসের সিটগুলোকে বিছানা বানিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে নাক ডেকে নিদ্রা গেলো আর সে বিরক্তিকর নাক ডাকার শব্দ সহ্য করে কাণ্ডারি হুঁশিয়ার এর মতো এতগুলো মানুষকে গন্তব্যে পৌঁছে দিলো তার জন্য কোন দাতা হাতেম তাই বলেছে যে, 'নাও বাবা ৫০০ টাকার একটি নোট তুমি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে আমাদেরকে গন্তব্যে নিয়ে এসেছো।' সিজারিং এর মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হওয়ার পর যেভাবে মিষ্টি বিতরণ হয় ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু সেটাতো একজন বাস চালকের বেলায় হয় না। অথচ ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার জন্য তাকে যতটুকু বকাবকি করা হয় তার শতগুণ করা হয় গাড়ি চালকের ভুলের জন্য। অথচ এ ডাক্তার এমবিবিএস পাস করার পর এফসিপিএস, এফ আরসিএসসহ কত বড় ডিগ্রিধারী। পক্ষান্তরে এ বাস চালকের নেই কোনো প্রশিক্ষণ বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। অন্য দিকে চালক যখন গাড়ি চালান তখন যাত্রীদের নানা রকম বাক্য শুনতে হয়। অনেকে মন্তব্য করেন সে কি গাড়ি চালাবে না গাড়ি খাদে ফেলে দিবে। কেউবা আবার বলে, এই ড্রাইভার জোরে চালাও। জোরে চালাতে গিয়ে রাস্তায় দুর্দশার দরুন একটু জোরে ঝাঁকি লাগলে এই বেটা ড্রাইভার কি খেয়েছিস? একজন আদেশ করেন আলো জ্বালাও, অন্যজন বলে, আলো নেভাও। কেউ বলে, টিভি অন করো আবার কেউ বলে, বেটা টিভি বন্ধ করো ঘুম নষ্ট হচ্ছে। কেউ বলে ফ্যান ছাড়ো কেউ আবার বলে, ফ্যান বন্ধ করো। একটু পরে একজন চিৎকার দিয়ে বলে, এই শালা ড্রাইভার ভাড়া দিয়ে আসিনি, ফ্যান ছাড়িসনি কেন? কেউ কেউ আলোচনা করে আরে ভাই এই লোক ড্রাইভার না কি? এরা হচ্ছে হেলপারের চেয়ে খারাপ। যাচাই করে দেখেন লাইসেন্স আছে নাকি? আবার অন্যজন বলে, এরা সব বস্তির পোলাপান বস্তিতে এদের জন্ম। কেউ বলে, গাঁজা আর মদ না খেলে এরা গাড়ি চালাতেই পারে না। এসব কথা শুনার পর সে মানুষটি কেমন করে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখবে? রাত জেগে যে গাড়ি চালাচ্ছে এরপর ইচ্ছায় হউক আর অবহেলায় দরুন ইউক দুর্ঘটনা ঘটে যায় এর সকল দোষ আমরা কেবলই চালকের ওপর চাপিয়ে দেই। চালক হিসেবে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে বিআরটিসিতে গেলে কত রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। বখশিশ না খেয়ে যদি প্রকৃত চালকদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হতো এবং এ প্রক্রিয়া সহজ করা হতো তাহলে লাইসেন্সবিহীন বা নকল লাইসেন্স দিয়ে কেউ গাড়ি চালাতো না। সাবেক এক মন্ত্রী বলেছিলেন, 'গরু-ছাগলের চেহারা চিনতে পারলেই ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া সম্ভব।' লাইসেন্স পাওয়ার বিড়ম্বনা কিছুটা হলেও শিথিল করা উচিত। আমাদের একটা অভ্যাস রয়েছে তা হলো ঠেকায় বা বিপদে না পড়লে কিছু বুঝতে চাই না। তুমুল জনপ্রিয় ও দেশবরণ্য চিত্রনায়কের কি নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন করার কথা? না। জাতির ভাগ্য ভালো যে এমন একজন চিত্রনায়ক যিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় তিনি আজ নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। যদি সড়ক দুর্ঘটনায় তার প্রিয়তমা স্ত্রীর অকাল মৃত্যু না হতো তবে তিনি এ পথে আসতেন কিনা জানি না। একটি সুন্দর কথা আছে- 'সময় থাকতে মনা হুঁশিয়ার' তাই বলতে হয় একা ইলিয়াস কাঞ্চন নয়, সকল মানুষকে ইলিয়াস কাঞ্চন হতে হবে। আরো একটি কথা স্মরণে রাখা দরকার যেটা হলো আসল কথা কেউ বলে না। কি মন্ত্রী আর কি ইলিয়াস কাঞ্চন। একজন গাড়ি চালকের যে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা উচিত সে ট্রেনিং তারা কখনও পায়নি। চরিত্র যদি পূত পবিত্র হয় তখন তার চলাফেরা, আচরণ ও দায় দায়িত্ব ভিন্ন রকম হয়। তখন সে সব বিষয় সামনে এলে সড়ক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে তা পরিহার করা সম্ভব। আমরা যেন কেমন হয়ে গেছি আল্লাহ রাসূল, কিয়ামত, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ও পূত পবিত্র চরিত্রের কথা বললেই মনে হয় সেকেলে এবং ওল্ডমডেল। এ জন্য আধুনিক ও স্মার্ট হবার জন্য আদর্শবান, চরিত্রবান আর আল্লাহওয়ালা হওয়ার কথা যেনো বলা একেবারে অসম্মানের কাজ মনে হয়। আজ যেখানে মানুষ চিৎকার করে বলছে, না কিছুই মানি না ধর্ম কর্ম মান্য করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সেখানে এক শ্রেণীর প্রগতিবাদী নেতারা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দানের ব্যাপারে যেন উদাসীন। চিকিৎসা গবেষণায় দেখা গেছে যাদের ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়। তাদের মধ্যে অপারেশনের সময় যাদের মৃত্যু ঘটে এর আশি শতাংশ তারা যারা ধর্মীয় জীবন যাপন করে না আর মাত্র বিশ ভাগের মৃত্যু হয় যারা ধর্মীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত। আমি অন্তত নিশ্চিত বলতে পারি যদি পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষাদান বা এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তা হলেও আশি শতাংশ দুর্ঘটনা কমে যাবে। অন্যথায় আপনার আমার ও ইলিয়াস কাঞ্চন সাহেবদের প্রচেষ্টা কোনো কাজেই আসবে না।

লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, গাজীপুর মহানগরী

শ্রমিকদের আইনগত অধিকার আদায় ও করণীয়

এ্যাডভোকেট এস.এম আলমগীর

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২ উপধারা ৬৫ তে শ্রমিকের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে– 'শ্রমিক' অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, তাহার চাকরির শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদারের মাধ্যমে মজরি বা অর্থের বিনিময় কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানত প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ১৩২ ধারায় একজন শ্রমিককে তার চাকরি হইতে লিখিত টার্মিন্যাশন করে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান যদি তার পাওনাদি পরিশোধ না করে তাহলে পাওনাদি চেয়ে ১৩২ ধারায় যে মোকদ্দমা শ্রমিক করতে পারে তাকে মজুরি মামলা বলে। ধারা-২ উপধারা-১১ ছাঁটাই-অর্থ অপ্রয়োজনীয়তার কারণে মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরির অবসান।

বি: দ্র: ছাঁটাই করিতে হইলে কলকারখানা মহাপরিদর্শককে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

ডিসচার্জ: অর্থ শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে অথবা অব্যাহত ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে মালিক কর্তৃক কোন শ্রমিকের চাকরির অবসান। এই সম্পর্কে ২ ধারার ৩৯ উপধরায় বলা হয়েছে। বরখাস্ত-অর্থ অসদাচরণের কারণে মালিক কর্তৃক কোন শ্রমিকের চাকরির অবসান। মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরির অবসান হলে শ্রমিক যে সকল পাওনাদি পেয়ে থাকে। মালিক যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে যেকোনো সময় শ্রমিকের পূর্বনোটিশ দিয়ে শ্রমিকের চাকরির অবসান করতে পারে আবার কোন শ্রমিক চাইলেও ২ (দুই) মাসের পূর্বনোটিশ দিয়ে চাকরি হইতে অব্যাহতি দিতে পারে। শ্রমিক বা মালিক যে কোন পক্ষ হইতে চাকরির অবসান হলে শ্রমিকগণ যে সকল সুবিধা পাইতে পারে তাহা নিম্নরূপ :

(১) যদি কোন বেতন বাকি থাকে, (২) ১২০ দিনের নোটিশ প্রেরণ, (৩) যত বছর চাকরি ছিল তত বছরের জন্য গ্র্যাচুইটি/ক্ষতিপূরণ, (৪) যদি অভোগকৃত অর্জিত ছুটি থেকে থাকে, (৫) যদি কোন বোনাস বা ভাতা থেকে থাকে, (৬) অন্যান্য কোন লভ্যাংশ যদি চাকরির নিয়োগপত্রে উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেগুলো একজন শ্রমিক পেতে পারে। উপরোক্ত পাওনাগুলো মালিক যখন শ্রমিকের চাকরির অবসান করবেন তখন প্রদান করিবেন কিন্তু কোন কারণে যদি না প্রদান করেন সে জন্য শ্রমিককে প্রতিষ্ঠানের বরাবরে একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে, এক বছরের মধ্যে, যার নাম হবে অনুযোগপত্র। এই অনুযোগপত্রে শ্রমিকের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা উল্লেখসহ একটি মোবাইল নাম্বার দিতে হবে, এই অনুযোগপত্র পাঠানোর পর যদি প্রতিষ্ঠান শ্রমিকের দেনা পাওনা দিয়ে দেয় তাহলে শ্রমিককে আর মামলা করতে হবে না। কিন্তু যদি প্রতিষ্ঠান দেনা-পাওনা পরিশোধ না করে তাহলে শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। শ্রম আইন দেওয়ানি ও

ফৌজদারি উভয় আইনকে ফলো করে কিন্তু শ্রম আদালতের মোকদ্দমাগুলো দেওয়ানি অর্থাৎ সিভিল ন্যাচার হিসাবে গণ্য করা হবে। উদাহরণ– ধরি, জনাব জামাল শারমিন গ্রুপে ৫ বছর যাবৎ সিনিয়র অপারেটর হিসাবে কর্মরত আছেন হঠাৎ বিগত-০৫.০৫.২০১৮ ইং তারিখে কারখানায় কাজ করতে গেলে জনাব জামালকে একটি টার্মিন্যাশনপত্র হাতে দিয়ে বলে যে আজ থেকে তোমাকে চাকরির অবসান করা হলো। আর তুমি কোন পাওনাদি প্রতিষ্ঠান হতে পাবে না, যেহেতু জনাব জামাল একজন শ্রমিক এবং শ্রম আইন সম্পর্কে তার জানা নাই, সুতরাং জামালকে আপনি পরামর্শ দেন সে এখন কী করবে। প্রথমে জামালকে কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান বরাবরে একটি অনুযোগপত্র পাঠাতে হবে। অনুযোগপত্রের নমুনা নিম্নরূপ :

প্রাপক,
বরাবর
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
শারমিন গ্রুপ লিমিটেড
নরসিংহপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

প্রেরক,
মো: জামাল উদ্দিন
পিতা- মৃত আব্দুল আজিজ
গ্রাম- চরলক্ষ্মীপুর
থানা- সোনাগাজী
জেলা-ফেনী

বর্তমান ঠিকানা:
মোঃ জামাল উদ্দিন

প্রযত্নে: আলমগীর হোসাইন
ক-৫৪, আমিন মঞ্জিল, শাহজাদপুর, প্রগতি সরণি, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

বিষয়: অনুযোগপত্র

জনাব,
যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এই মর্মে আপনার বরাবরে অনুযোগপত্র প্রেরণ করিতেছি যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার প্রতিষ্ঠানে বিগত-১২.০৫.২০১২ ইং তারিখে চাকরিতে যোগদান করি। আমার পদবি ছিল সিনিয়র অপারেটর এবং আমার আইডি কার্ড নং-১২৩৪। একজন স্থায়ী শ্রমিকের মর্যাদায় আমার সর্বশেষ মাসিক মূল মজুরি ছিল-৯,৯৩০/ টাকা এবং সর্বমোট মজুরি ছিল-১৫,০০০/- টাকা, অত্র প্রতিষ্ঠানে আমার চাকরি জীবন ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। বিগত-০৫.০৫.২০১৮ ইং তারিখে প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অফিসার জনাব মো: শামসুল আলম সাহেব কোনরূপ পূর্বনোটিশ ছাড়াই আমাকে আমার স্থায়ী চাকরি হইতে লিখিত টার্মিন্যাশন করেন। আমি টার্মিন্যাশন অনুযায়ী পাওনাদি দাবি করিলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জনাব মো: শামসুল আলম সাহেব আমাকে বিভিন্ন হুমকি প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়া কোনো প্রকার অর্থ প্রদান করা হইবে না মর্মে জানাইয়া প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির করিয়া দেন। আমাকে আপনার প্রতিষ্ঠান লিখিতভাবে টার্মিন্যাশন করায় আমার পাওনাদি নিম্নরূপ:

(ক) টার্মিন্যাশন সংক্রান্ত নোটিশ বাবদ ১২০ দিনের সমমজুরি-৯,৯৩০x৪=৩৯,৭২০/

(খ) এপ্রিল-২০১৭ এর ৫ দিনের বকেয়া মজুরি বাবদ- ১৫,০০০/-

(গ) ৬ বছর চাকরি কালের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ- ৯,৯৩০x৬ = ৫৯,৫৮০/-

(ঘ) অভোগকৃত অর্জিত ছুটি বাবদ ৪০ দিনের- ২৪,০০০/-

অতএব বিনীত নিবেদন এই যে, উপরোক্ত অবস্থা মোতাবেক আমার আইনানুগ পাওনা বাবদ সর্বমোট টাকা অত্র পত্র প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে প্রদান করিতে জনাবের মর্জি হয়। অন্যথায় আমি আইনের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইব।

বিনীত নিবেদক
মো: জামাল উদ্দিন
পদবি- সিনিয়র অপারেটর
মোবাইল-

অনেকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করে থাকেন যা শ্রম আইনসহ উচ্চ আদালত স্বীকৃতি দেয় না। আর যদি কোন মালিক কিংবা কোম্পানির কোন কর্মকর্তা কোন কারণ ছাড়াই চাকরি হইতে বাহির করিয়া দেয় তাহলে শ্রম আইন-২০০৬ ধারা-৩৩ ক্ষমতাবলে চাকরি হইতে বাহির করিয়া দেয়ার ৩০ দিনের মধ্যে অনুযোগপত্র পাঠাতে হবে যদি মালিক পক্ষ অনুযোগপত্রের জবাব প্রদান না করে তাহলে ৩০ দিনের পরে শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। আর মোবাইল নম্বর দিতে যাতে করে কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আর যিনি টার্মিন্যাশন/বের করে দিবে তার নামটা দিতে হবে যাতে করে পরবর্তীতে ফৌজদারি মামলা করতে গেলে তার নামে সমন ইস্যু বা ওয়ারেন্ট ইস্যু করা যায়। কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক যখন অনুযোগপত্র দেয়ার পরও পাওনা পরিশোধ না করে তাহলে শ্রম আইন-২০০৬ এর ১৩২ ধারা অনুযায়ী অনুযোগপত্র পাঠানোর তারিখ হইতে এক বছরে মধ্যে আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। সাধারণত শ্রমিকগণ নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে মামলা/মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে শ্রম আইনের অধীনে শ্রম আদালতে যে সকল মোকদ্দমা দায়ের হয়: মজুরি মোকদ্দমা, চাকরি চেয়ে মোকদ্দমা, বরখাস্তকে চ্যালেঞ্জ করে মোকদ্দমা, সুযোগ সুবিধা চেয়ে মোকদ্দমা, রায় বাস্তবায়ন না হলে ফৌজদারি মামলা, মাতৃত্বকালীন দাবি পরিশোধ না করলে ফৌজদারি মামলা, ক্ষতি পূরণ মামলা, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কম মজুরি প্রদান করিলে ফৌজদারি মামলা, ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত শ্রম পরিচালকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা, ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন বাতিল সংক্রান্ত মোকদ্দমা, ট্রেড ইউনিয়ন বা অন্য কোন কারণে নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমা, শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক ফৌজদারি মোকদ্দমা মামলা, অবৈধভাবে ট্রেড ইউনিয়ন এর সদস্যদের চাকরি হইতে বের করলে সরাসরি মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়। উপরোল্লিখিত ১৩ প্রকার মামলা/মোকদ্দমা ছাড়াও কখনো কখনো কিছু বিবিধ মামলা/মোকদ্দমা দায়ের হয়। বাংলাদেশে সাতটি শ্রম আদালত রয়েছে এবং একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল রয়েছে যার অধিক্ষেত্র নিম্নরূপ

শ্রম আদালতের অধিক্ষেত্র

নং	শ্রম আদালতের নাম	এখতিয়ার	অবস্থান
১	প্রথম শ্রম আদালত	জেলা ঃ মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, জামালপুর জেলা । থানা ঃ কেরানীগঞ্জ, দোহার, সাভার, তেজগাঁও, নবাবগঞ্জ, ধামরাই, রমনা ও গুলশান থানা । ** ঢাকা ইপিজেড, আশুলিয়া, ঢাকা	৪, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ । (৫ম তলা)
২	দ্বিতীয় শ্রম আদালত	জেলা ঃ ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, গোপাল গঞ্জ, গাজীপুর জেলা । থানা ঃ সবুজবাগ, কোতোয়ালি, মতিঝিল, সূত্রাপুর ও ডেমরা থানা । **আদমজী ইপিজেড, আদমজী নগর, নারায়ণগঞ্জ ।	৪, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ । (৭ম তলা)
৩	তৃতীয় শ্রম আদালত	জেলা ঃ ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, নারায়ণগঞ্জ জেলা । থানা ঃ লালবাগ, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, মিরপুর, পল্লবী, ক্যান্টনমেন্ট ও উত্তরা থানা । ** কুমিল্লা ইপিজেড, পুরাতন বিমানবন্দর, কুমিল্লা । *** প্রিন্ট মিডিয়া	৪, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ । (৬ষ্ঠ তলা)
৪	প্রথম শ্রম আদালত	চট্টগ্রাম বিভাগ	জেলা জজের বাস ভবন, থানা-পাঁচলাইশ, জেলা-চট্টগ্রাম ২য় তলা ।
৫	দ্বিতীয় শ্রম আদালত	চট্টগ্রাম বিভাগ	জেলা জজের বাস ভবন, থানা-পাঁচলাইশ, জেলা-চট্টগ্রাম (নিচ তলা)
৬	রাজশাহী শ্রম আদালত	রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	বনানী মোড়, রাজপাড়া, থানা- কোতোয়ালি, জেলা-রাজশাহী ।
৭	খুলনা শ্রম আদালত	খুলনা বিভাগ, খুলনা	স্যার ইকবাল রোড, স্টার সিনেমা হলের বিপরীত, পুরাতন অগ্রণী ব্যাংক ভবন (৩য় তলা)
	শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল	প্রথম শ্রম আদালত, ঢাকা, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা, তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা, প্রথম শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম, রাজশাহী শ্রম আদালত, রাজশাহী, খুলনা শ্রম আদালত, খুলনা,	৪৩, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নং	দপ্তরের নাম	অফিস প্রধানের পদনাম	অফিসের ঠিকানা	ফোন নং
১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়, ভবন নং-৭ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সচিব	মন্ত্রণালয় মোবা: ০১৭১৩১৩৮১৫১ ই-মেইল-Info@mole.gov.bd ওয়েবসাইট:www.mole.gov.bd	৯৫১৪৩৬৬
২	কলকারখানাও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অধিদফতর, ২৪-২৫ কাওরান বাজার, ৩য়-৪র্থ তলা, ঢাকা ।	মহাপরিদর্শক	অধিদফতর মোবা:০১৭১৬৪৮৮৬৩৩ ই-মেইল **ig@dife.gov.bd** ওয়েবসাইট:www.dife.gov.bd	৯১২৬৯২০
৩	শ্রম পরিদফতর, ৪ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা ।	শ্রম পরিচালক	পরিদফতর মোবা:০১৮১৯৫৫৮০৬৫ ই-মেইল annamul136@yahoo.com ওয়েবসাইট: ww.dol.gov.bd	৯১০১৯৪১

লেখক : আইনজীবী, লেবার কোর্ট, ঢাকা

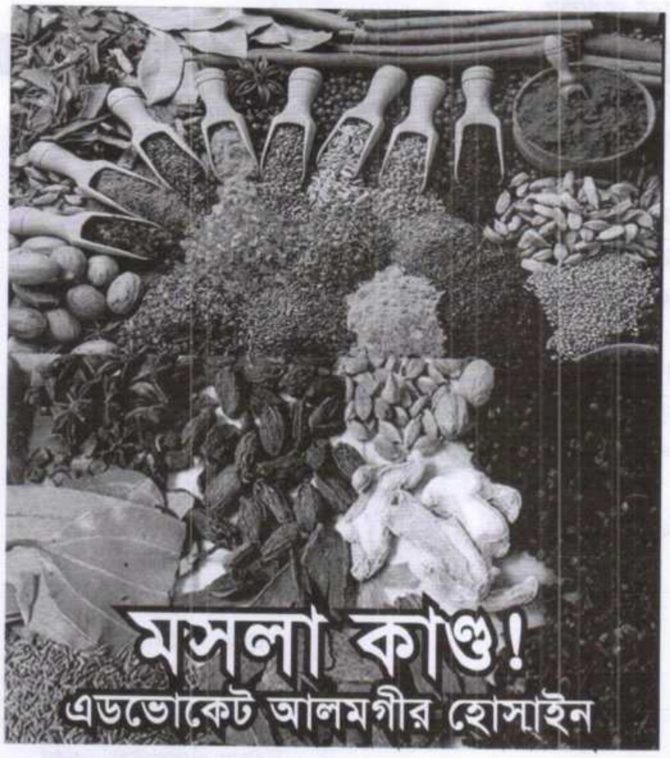

মসলা কাণ্ড!

এডভোকেট আলমগীর হোসাইন

মসলা নিয়ে যুদ্ধ ! ভাবা যায়? হ্যাঁ এমন ঘটেছিল । হিমালয় থেকে সমুদ্র পাদদেশে অদৃশ্য মসলার ঘ্রাণকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে বড় যুদ্ধ হয়েছে । যানা যায়, মসলার জন্য প্রথম যুদ্ধ হয় ভারতবর্ষে । পর্তুগিজদের সাথে কালিকটের রাজার মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় । মসলার খোঁজে প্রথম বের হয়েছিল পর্তুগিজ, তারপর ডাচ আর শেষে ইংরেজরা । সপ্তম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরব বণিকরা পশ্চিমে ভারতীয় মসলা সরবরাহ করে আর বণিকদের সাথে সাথে ইসলামেরও দাওয়াত চলে এসেছিল এই অঞ্চলে । ইউরোপীয়রা তাদের নিষ্প্রাণ খাবারকে সুস্বাদু করতে মসলার উৎসের খোঁজে সমুদ্র অভিযানে বের হয় । কিন্তু চাহিদা যত বেশি ছিলো, মসলা সংগ্রহ ছিলো ততটাই কঠিন । ওই সময় মসলার মূল্য ছিলো সোনার চেয়েও বেশি । মসলার খোঁজে বের হয়ে কলম্বাস ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেন । এই মসলার খোঁজেই পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা একদিন জাহাজ ভেড়ান ভারতের কেরোলা উপকূলে । ভারতবর্ষে আরব বণিকদের এক সময় মসলার একচেটিয়া ব্যবসা ছিল । কিন্তু ভাস্কো দা গামার আগমনের পরে এক সময় শেষ হয়ে যায় আরব বণিকদের এই একচেটিয়া ব্যবসার দখল। পরবর্তীতে মসলার একচেটিয়া বাণিজ্য পর্তুগিজদের হাতে চলে আসে । প্রায় দেড়শ বছর পর্যন্ত মসলার বাণিজ্য তাদের হাতেই ছিল । এর ফলে সে সময় তারা ইউরোপে একচেটিয়া মসলার ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় । একচেটিয়া বাণিজ্যের কারণে পর্তুগিজরা মসলার দাম তখন এতো বাড়িয়েছিল যে, ডাচ বণিকদের মনে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল । এর ফলশ্রুতিতে ডাচরা ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে যাত্রা করে এবং ভারতবর্ষে মসলার ব্যবসার জন্য তারা 'ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি কোম্পানি গঠন করে। পরবর্তীতে ১৬২৯ সালের দিকে এই কোম্পানি জাকার্তা অধিকার করে এবং মসলার দেশ ইন্দোনেশিয়া মসলা উৎপাদন শুরু করে । সেখানে চাষিদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে তারা । এক সময় পরিলক্ষিত হয় সেখানে চাষিদের নিজেদের জমি বলতে আর কিছু নেই এবং তারা কোম্পানির কাছ থেকে দাদন নিয়ে মসলা চাষ করছে । ফলে পরবর্তীতে নিজ ভূমেই পরবাসী হয়ে পড়ে তারা । মসলার খোঁজে প্রথমে পর্তুগিজ, তারপর ডাচ এবং সর্বশেষ ইংরেজরা ইন্দোনেশিয়া প্রবেশ করে। পর্তুগিজদের সরিয়ে ডাচরা মসলার উৎপাদন শুরু করার পর তারা দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয় । ইংল্যান্ডেও সে সময় মসলার প্রচুর চাহিদা থাকায় ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা প্রাচ্যের মসলার বাজারে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয় । উল্লেখ্য, সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রিটেনে লবঙ্গের দাম ছিলো প্রায় সোনার দামের সমান । যার ফলশ্রুতিতে ইংরেজদের বিখ্যাত 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' তখন মসলার বাণিজ্যে নেমে পড়ে । কোম্পানির প্রথম জাহাজ এই উদ্দেশ্যে প্রাচ্যের দিকে যাত্রা করে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি । তারা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সুরাটে মোগল সম্রাটের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে নিয়ে প্রথম বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে । তারা ঠিক করেছিল ভারতবর্ষে থেকে বস্ত্রের ব্যবসা করবে এবং তা থেকে যে মুনাফা হবে তাই দিয়ে মসলার ব্যবসা করবে । 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে মসলার বাণিজ্য শুরু করলেও ডাচদের চাপে তারা সেখানে বেশি দিন টিকতে পারেনি । মাত্র ১৪ বছর পরেই ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে তাদের বেরিয়ে আসতে হয় । তারপর তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সীমাবদ্ধ ছিল ভারতবর্ষের মধ্যেই । তাদের মসলার বাণিজ্য এখানেই শেষ হয় । এরপর ধীরে ধীরে তারা ভারতবর্ষে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিল । এক সময় মসলার বাণিজ্য করতে আসা কোম্পানি পরবর্তীতে এই ভারতবর্ষ রাজত্ব করে প্রায় দুই শ' বছর । কথিত রয়েছে, মধ্যযুগে এক পাউন্ড আদা ছিলো একটি ভেড়ার সমান মূল্যবান । এক পাউন্ড জয়ত্রী ছিলো তিনটি ভেড়া বা অর্ধেক গরুর সমান । অন্যদিকে এক বস্তা মরিচের দাম ছিলো একজন মানুষের জীবনের দামে! অন্য একটি হিসাব অনুযায়ী, মধ্যযুগের শেষভাগে পশ্চিম ইউরোপ প্রায় এক হাজার টন মরিচ ও আরও এক হাজার টন অন্যান্য সাধারণ মসলা প্রতি বছর আমদানি করতো । এসব মসলার মূল্য ছিলো ১৫ লাখ লোকের জন্য বার্ষিক শস্য সরবরাহের সমতুল্য । বিশ্বাস করা হয়, পার্থিয়ান যুদ্ধের মূল কারণ ছিল মসলা । রোমানরা নিশ্চিত করতে চাইছিলো ভারতে মসলার বাণিজ্য রুট তাদের জন্যই খোলা থাকবে । তারা ভারত ও চীন থেকে মসলা ও সিল্ক রুট খুঁজে পেতে পশ্চিম ইউরোপকে সাহায্য করেছিলো । ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান, ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও ভাস্কো দা গামা তাদের ঐতিহ-াসিক অভিযানে এশিয়ার মসলা ভূখণ্ডে নতুন রুট খুঁজে পেয়েছিলেন । এখানেও ছিলো মসলা মরিচের গন্ধ । এই মশলার গন্ধ কি শুধু মানুষকে যুদ্ধ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, না এই মসলাকে নিয়ে প্রেম-ভালোবাসা ও কবিতা রচিত হয়েছিল । জীবনানন্দ দাশ দারুচিনি দ্বীপ বলতে কোন জায়গা বুঝিয়েছিলেন? সিংহল সমুদ্র থেকে যেহেতু যাত্রা শুরু করেছিলেন, কাজেই এটা শ্রীলঙ্কা হওয়ার সম্ভাবনা আছে । দারুচিনি দ্বীপ ছিল মসলার জন্য বিখ্যাত জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম । মসলা ছিল সেই সময়ের রাজা-রানীর জন্য উপহার সামগ্রী । সোলোমনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শেবার রানী । উপহার হিসেবে এনেছেন ১২০ ট্যালেন্ট বা প্রায় চার হাজার কেজি সোনা, অনেক অনেক দামি রত্ন আর নানা রকমের মসলা । সোলোমন তখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রাজা । দারুণ প্রতাপ তাঁর! তাঁকে উপহার হিসেবে মসলা দেওয়া কেন? কারণ, মসলা খুব দামি জিনিস । কেমন দামি জিনিস? খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে এক মুঠো এলাচি দিয়ে একটা দাস কেনা যেত! আজও কিছু মসলা বেশ দামি । যেমন এক কেজি জাফরানের বাজারমূল্য ১০ লাখ টাকার বেশি! সেকালে তিনটি মূল জিনিসের উৎপাদন ও সরবরাহ সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করত রাষ্ট্র । সেগুলো হলো তেল, লবণ আর মসলা । তেল একটি ভোগ্যপণ্য, যা সহজে নষ্ট হয় না । কিছু কিছু তেল শত শত বছরেও নষ্ট হয় না বলে জানা যায় । যে তেল নষ্ট না হয়ে যত দীর্ঘদিন টিকে থাকে, সেই তেল তত দিন মুদ্রাবিহীন বাণিজ্যে মুদ্রার সমান । যেমন জয়তুন তেল, অলিভ অয়েল । ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় সোনার পরিবর্তে জয়তুন তেলের সাহায্যে লেনদেন হতো । এই তেলের লেনদেনে ভাগ বসাতেন বাদশাহ সোলোমন । আর লবণের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সব সময়ই ছিল । কতটুকু নিয়ন্ত্রণ? প্রাচীন গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারতের একাংশ জয় করেছিলেন । তার সঙ্গে থাকা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী যা লুটপাট করত, সেখানে তিনি তিনটি জিনিস সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতেন সোনা, নারী আর লবণ! এই তিনটি সম্পদ রাষ্ট্র বণ্টন করবে । লবণের বিষয়টি হাস্যকর মনে করার কোনো কারণ নেই । কারণ, লবণ প্রকৃতির

নির্ধারিত উৎসেই পাওয়া যায়। অন্য কোথাও না। খুবই দুষ্প্রাপ্য! এখনকার মতো তখন দোকানে গিয়ে এক কেজি লবণ কিনে আনার

ভাবনা ছিল অচল। এখনো যুদ্ধে তাই লবণ নিয়ন্ত্রণ একটা কৌশল। চাকরিজীবীরা প্রতি মাসে যে 'স্যালারি' পান, কিংবদন্তি হলো সেই স্যালারি শব্দটি এসেছে 'সল্ট' শব্দ থেকে। আর সল্ট শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ লবণ। বলা হয়ে থাকে, প্রাচীন রোমে সৈন্যবাহিনীতে লবণ কেনার জন্য যে টাকা দেওয়া হতো সেটাই স্যালারি। সেখান থেকেই শব্দটা রয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। 'কার নুন খাও' বা 'যার নুন খাই, তার গুণ গাই'-এর অর্থ কোনো রাজার বা সৈন্যদলের নুন খাও অর্থেই রয়ে গেছে প্রাচীন নুন খাওয়ার তুলনাটি। তেমনি 'নিমক-হারামি' বলা হয় বিশ্বস্ততা হারালে বা আনুগত্যের বর খেলাপ করলে।

সভ্যতা বিনির্মাণে মসলা: আর মসলা? মসলার হাত ধরে সভ্যতা এগিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই মসলা একটি বিলাসী ভোগ্যপণ্য। এটি সবার কাছে সহজলভ্য করা হতো না। বাজারে ছাড়া হতো চড়া দামে। সব সময় যেকোনো বিলাসীপণ্য নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র। মসলাচাষিরা থাকতেন কঠোর নিয়ন্ত্রণে। এটি আমাদের মানবসভ্যতার পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস। পাঁচ হাজার বছর ধরে সমাজের মানুষ কোন মসলা খাবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে সমাজপতিরা। মরিচ, হলুদ, রসুন এসব শুকনো মসলা কর হিসেবে দেয়া যেত। উদাহরণ আছে। ধান ফুরাল, পান ফুরাল খাজনার উপায় কী? আর ক'টা দিন সবুর করো রসুন বুনেছি। 'মসলা' শব্দটি খুব প্রাচীন নয়। ধারণা করা হয়, মসলা ফারসি শব্দ থেকে এসেছে বাংলায়। ফিনিশীয়রা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে চষিয়ে বেড়াতো তাদের জাহাজভর্তি মসলা। এশিয়ার সমুদ্রে দাপটে বেড়ানো আরব বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় তারা বেশ ব্যবসার পসার জমিয়েছিল। পরে কিছুকাল আরবরা দখল করে এই বাণিজ্য। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মসলা সংগ্রহ করতে থাকে। ইন্দোনেশিয়া থেকে আফ্রিকার নানা উপকূলে মসলা সংগ্রহ করতো তারা। তারপর সে বাণিজ্য চলে যায় ইউরোপীয়দের হাতে। মূলত পর্তুগিজ আর ডাচদের হাতে। এই ইতিহাসের পুরোটাই মসলার রাজনীতি এবং রক্তক্ষয়ের ইতিহাস। সিল্ক রোড দিয়ে যে পণ্যটির সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হতো, তা এই মসলা। হাজার রকমের নাম, গন্ধ আর স্বাদ তাদের! আলেকজান্ডার ভারতে আসার আগে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ এলাচি বা লবঙ্গের স্বাদ পায়নি। এই দুটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মসলা। তার সময়ও যারা এলাচি-লবঙ্গের স্বাদ পেতেন, তারা রাজা-মহারাজা! তেমনি ইংরেজ উপনিবেশ আমলে বণিকদের মাধ্যমেই সম্ভ্রান্ত ও উচবিত্তরাই পেতো বিশেষ কিছু মসলা। সাধারণ মানুষ এর স্বাদ পেত খুব কম। কত হাজার কোটি টন মসলা চীন থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছে তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। মাঝখানে যেখানেই যে রাজার জমিতে পড়েছে এই মসলা, সেখানে খাজনা দিতে হয়েছে। পথের কর! ফলে উৎপাদনস্থান থেকে পরিবহনের কারণে মসলার দাম ভোক্তা পর্যন্ত পৌছাতে বহু বহুগুণে বেড়ে যেত।

বাংলাদেশে মসলা : আমাদের এই দেশে গরম মসলা মানুষ চিনতে শুরু করে খুব বেশি দিন আগে নয়। এর কারণও আছে। বাঙালির জীবনে মাংস খাওয়ার রেওয়াজ কম। নদীমাতৃক দেশ হওয়ার কারণে বাঙালি আমিষের জন্য মাছের দিকে ঝুঁকেছে বেশি। নদীপাড়ের জনপদে মসলা ব্যবহার সরল। মাছের তরকারিতে খুব বেশি মসলা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এদিকে যেখানে নদী বা সাগর নেই, সেখানে মানুষ আমিষের জন্য মাংসনির্ভর। মাংস রাঁধতে মসলা বা কোনো সুগন্ধি উপকরণ সংযোগ করা কবে থেকে শুরু, তা জানা যায় না। অনেকে মজা করে বলেন, সভ্যতার ইতিহাসে কিছু মসলা সব সময় দামি বস্তু বলে এদের নাম 'গরমমসলা'! কিন্তু বিষয়টি অন্য রকম। এই মসলাগুলোতে 'দেহের উষ্ণতাবর্ধক' গুণ আছে। স্বাদও একটু ঝাঁজালো। তাই সম্ভবত এর নাম গরমমসলা। সব মসলাই দেহের কোনো না কোনো উপকার করে। যেমন হলুদ। কোষের ক্ষয়পূরণে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যারা হলুদ বেশি খাবেন তাদের স্মৃতিভ্রষ্ট রোগ কম হয়। হলুদ যারা খান, তারা মানসিকভাবে 'প্রফুল্ল থাকেন বলেও জানা যায় বিভিন্ন লেখা পত্রে। যে অঞ্চলে খুব গরম, সেই অঞ্চলে ঝাল খাওয়ার প্রচলন বেশি। আদিকাল থেকেই মসলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, উপাসনা, সংরক্ষণ, ওষুধ ও নানাকাজে মানুষের জীবনের অংশ হয়ে রয়েছে। এখন থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় মসলার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অন্যদিকে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল উপাদান ছিলো মসলা। সুগন্ধি ও কাপড়ের সঙ্গে মেসোপটেমিয়া, চীন, সুমেরিয়া, মিসর ও আরবে মসলার বাণিজ্য করতো ভারত। রামায়ণে লবঙ্গের কথা উল্লেখ রয়েছে। আবার প্রথম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন লেখালেখিতেও এর কথা পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে উটের কাফেলায় করে এসব মসলা কালিকট, গোয়া ও পূর্ব থেকে কার্থেজ, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোমে পাঠানো হতো। বর্তমানে এসব মসলা প্রস্তুত হিসেবে কিনতে পাওয়া যায়। এমন একটি সময় ছিলো যখন ভারতীয় মসলা পেতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতো বণিকরা। গুণগত মানের মসলা বাণিজ্য আয়ত্ত করার জন্য উৎসুক অন্যান্য শক্তিশালী সাম্রাজ্য থেকে ভারতে লম্বাপথ ও কঠিন সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আসতো ব্যবসায়ীরা।

ঈদে মসলা কাণ্ড : ঈদের সময় মসলার দোকানে দেখা যায় প্রচুর ভিড়। তাই আগে ভাগে যেনে রাখা দাম আর মসলার পাওয়ার স্থান আপনাকে সাহায্য করতে পারে অনেকাংশে। ঈদের সময়কার মসলা মানেই জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ, জয়ত্রী। আর এ মমলাগুলো কিনতে আপনাকে গুনতে হবে বেশ কিছু টাকা। চীন, ভিয়েতনাম থেকে আমদানিকৃত দারুচিনি কিনতে আপনাকে গুনতে হবে প্রতিকেজি ২৭৫ থেকে ৩২০ টাকা। আর অন্যদিকে এলাচ বিক্রি হচ্ছে প্রতিকেজি ১৬০০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে। লবঙ্গ বিক্রি হচ্ছে ১৫০০ থেকে ২৫০০ টাকার মধ্যে। জয়ত্রীর দাম পড়বে ২৫০০ টাকা থেকে ২৮০০ টাকা। পোস্তদানা কিনতে গুনতে হবে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা। জিরা ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। আদা পাচ্ছেন ২০০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে আর হলুদ ২০০ থেকে ২২০ টাকা। তেজপাতা ১৭০ থেকে ২০০ টাকা আর মরিচের ১৫০ থেকে ২০০ এবং ধনে ১৮০ থেকে ২২০ টাকা। অন্য দিকে রসুনের দাম ১০০ টাকা থেকে ১১০ টাকার মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিশমিশের দাম পড়বে ৩০০ থেকে ৩১০ টাকা। অন্য দিকে জায়ফল পেয়ে যাবেন প্রতি পিস ১০ টাকা করে। আলুবোখরার দাম পড়বে ৬০০ থেকে ৯০০ টাকার ভেতরেই। আর পোস্তবাদাম কিনতে হলে গুনতে হবে ১৮০০ থেকে ২৫০০ টাকা। কাঠবাদামের দাম পড়বে ৭০০ টাকা আর কাজুবাদামের দাম পড়বে ১৮০০ টাকার মধ্যে।

আদিকাল থেকেই মসলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, উপাসনা, সংরক্ষণ, ওষুধ ও নানাকাজে মানুষের জীবনের অংশ হয়ে রয়েছে। এখন থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় মসলার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

মসলার উপকারী গুণ : মসলা মানুষের বার্ধক্য রোধ করে। কোষের ক্ষয়কে ধীর করে। সবচেয়ে বড় কথা, যেকোনো মসলার গন্ধ শুধু নাকেই সুড়সুড়ি দেয় না, পেটের খিদে জাগানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্য খিদেও জাগায়! বিষয়টি বোঝা সহজ। সব মসলারই সুগন্ধ আছে। মসলা পেটে যতটুকু কাজ করে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজে করে মগজে। বিভিন্ন রকম মসলা নানা রকম হরমোনের জন্ম দেয়। পৃথিবীর সব মসলার গন্ধই উত্তেজক। মসলার সুগন্ধ আমাদের মস্তিষ্কে হর্ষ (Euphoric state) উৎপাদন করে।

ইতিহাসে দেখি, আওরঙ্গজেব খুব এলাচি আর লবঙ্গ খেতেন। আর জাহানারা পানের সঙ্গে এলাচি-দারুচিনির প্রচলন করেছিলেন। এলাচি কেন? মুখে সুগন্ধ হবে আর প্রেমময় মুড তৈরি হবে। বলে রাখা ভালো, প্রেমিকার কাঁকন পরা হাতে প্রেমিককে পান খাওয়ানোর প্রচলনটি সিন্ধু অববাহিকার নয়। ওটি ইরান থেকে এসেছে। এবং পানও উত্তেজক, গরমমসলার মতো! মহামতি আকবর তো আরও এক কাঠি ওপরে। তিনি গরুকে এলাচি আর দারুচিনি খাওয়াতেন ভাতের মাড়ের সঙ্গে, ঘাসের সঙ্গে! যখন সে গরুর মাংস থেকে কাবাব বানানো হতো তখন তার মাংসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকত সুগন্ধ! বিশেষ দিনে জবাই হতো সে গরু।

লেখক : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) এবং বাংলাদেশ

আবুল হাসেম

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সারাবিশ্বে শিল্পায়ন এবং শ্রমিকের শ্রমের ন্যূনতম মান একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত উন্নীত ও বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘের যে সংস্থাটি বিগত ১০০ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে তার নাম আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও।

আইএলও এর কথা আমরা সকলেই কম-বেশি শুনেছি। ১৯১৪-১৯১৮ সালে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তির বিধান অনুসরণেই ১৯১৯ সালে আইএলও-এর জন্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বনেতারা অনুভব করেন সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। আর সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো শ্রমিক। সুতরাং শ্রমিকরা যদি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয় তবে সমাজে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি ও সংঘাত আসতে বাধ্য। এই অনুধাবন থেকেই জন্ম নেয় লিগ অব ন্যাশন্স যা পরবর্তীতে বর্তমান জাতিসংঘের রূপ নেয়। আর লিগ অব ন্যাশন্স তথা জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থা হিসেবে এগিয়ে চলেছে আইএলও।

জাতিসংঘের প্রায় সব কয়টি সদস্য দেশই আইএলও-এর সদস্য। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইএলও-এর সদর দপ্তর অবস্থিত। জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংগঠন থেকে আইএলও-এর সাংগঠনিক কাঠামো কিছুটা ভিন্ন। সরকার, মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি ধারা আইএলও পরিচালিত হয়। বর্তমানে আইএলও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় নানা ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু তৎপরতার মধ্যে রয়েছে দৈনিক ও সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ কাজের সময় নির্ধারণ, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা যে কোন বিপদ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করা, শিশু কিশোর ও নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা, প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, মজুরির ক্ষেত্রে সমতাবিধান, শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করা এবং কর্মমুখী ও কারিগরি প্রশিক্ষণে সহায়তা করা ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আইএলও-কে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক দেশের সরকারই আইএলও এর কর্মপরিধি ও এখতিয়ারের সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। আইএলও-এর নির্দেশনা বা পরামর্শ মেনে চলাকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল মনে করেন। এর মাঝে মামলা-মোকদ্দমাও কম হয়নি। এমনকি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস পর্যন্ত গড়ায় কোনো কোনো বিষয়। তবে কোন কিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনি আইএলও -এর অগ্রযাত্রাকে। জেনেভার সদর দফতরে গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র থেকে শ্রমিক স্বার্থরক্ষা ও শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিপুল সংখ্যক বই, লিফলেট, পোস্টার, গবেষণাপত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। সরেজমিনে কাজ করার জন্য রয়েছে আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং দেশে দেশে রয়েছে কান্ট্রি অফিস। শ্রেণীসংঘাত ঘুচিয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠা, শ্রমিকদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৬৯ সালে শান্তি পুরস্কার লাভ করে আইএলও।

১৯৭২ সালের ২২ শে জুন বাংলাদেশ আইএলও-এর সদস্যপদ লাভ করে। আইএলও- এর ঢাকা অফিসের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ২৫ শে জুন। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে আইএলও-এর ৭টি মৌলিক কনভেনশনসহ মোট ৩৩টি কনভেনশন বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন করে। এই পর্যন্ত বাংলাদেশ মোট ৩৮টি আইএলও Recommendation অনুসমর্থন করেছে।

লেখক: কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

পারিবারিক বন্ধন: সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণশক্তি

মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ আদিল

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর Interrelated. রাষ্ট্রের একক হচ্ছে পরিবার। পৃথিবীর প্রথম পরিবার হযরত আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। বৈধ পন্থায় সম্পর্কিত একজন পুরুষ, একজন নারী ও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গড়ে ওঠে একটি পরিবার। এভাবে প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় বিস্তার লাভ করে পরিবারের ধারা। "হে মানব সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের সাজিয়েছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।" (সূরা হুজুরাত : ১৩) পরিবারকে আমরা ছোট্ট সমাজ সংস্থার (Small Community) পাশাপাশি একটি টেকসই মানবীয় সংস্থা (Stable Human Institution) ও স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান (Natural Institution) হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। মানবসমাজে মনুষ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে দুটি মতবাদ প্রচলিত। তার একটি হচ্ছে মানুষ এক আদমের বংশজাত। "আর তিনি (আল্লাহ) তাদের দু'জন থেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী।" (সূরা নিসা : ১) অন্য দিকে, বিবর্তনবাদীরা যারা ডারউইনের "Theory of Evolution" এর সমঝদার, তারা মনে করেন শেওলা, কেঁচো, সাপ, শিম্পাঞ্জি ও বানরের পরিবর্তিত ধারাবাহিক রূপান্তর মানুষ। মুসলিম দর্শন অনুযায়ী পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিবাহ। "এবং তার (আল্লাহর) একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মমতা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।" (সূরা আর-রূম : ২১)

ব্যক্তির সমষ্টি পরিবার, আবার সে পরিবারই মানুষ গড়ার কারখানা। পরিবার থেকেই পৃথিবীর প্রায় সকল মহামনীষীদের শিক্ষার হাতেখড়ি। একটি শিক্ষিত, রুচিশীল ও সমৃদ্ধ পরিবার যেন একটি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, উদার ও উন্নত রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি। একটি পরিবারের মৌলিক উপাদান হচ্ছে– পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ-মমতা, ঐক্য, পারস্পরিক পরামর্শ, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রয়াস, পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সুখ-দুঃখের অংশীদার, ভিন্নমতকে গ্রহণ করা বা সহ্য করা। মা ও বাবা দু'জনের একজনকে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী আর অপরজনকে প্রেসিডেন্ট ও পরিবারের অন্য

পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ-মমতা, ঐক্য, পারস্পরিক পরামর্শ, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রয়াস, পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সুখ-দুঃখের অংশীদার, ভিন্নমতকে গ্রহণ করা বা সহ্য করা। মা ও বাবা দু'জনের একজনকে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী আর অপরজনকে প্রেসিডেন্ট ও পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে রাষ্ট্রের জনগণ হিসেবে ধরে নিলে একটি পরিবারের কাঠামো একটি রাষ্ট্রের কাঠামোর প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করে।

সদস্যদেরকে রাষ্ট্রের জনগণ হিসেবে ধরে নিলে একটি পরিবারের কাঠামো একটি রাষ্ট্রের কাঠামোর প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করে। যদিও দার্শনিক প্লেটোর মতে, "পরিবার হচ্ছে সমাজজীবনের সব অনৈক্যের (discord) মূল কারণ। কারণ পরিবার ওই মানুষকে শিক্ষা দেয়: আমি ও তুমি, আমার ও তোমার" পরিবার হচ্ছে একটি পাঠশালা আর মা-বাবা সে পাঠশালার নিঃস্বার্থ শিক্ষক আর ছেলে-মেয়ে হল সে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। আরবি কবির ভাষায়- 'মাতৃক্রোড়ই হচ্ছে সন্তান-সন্ততির জন্য অনবদ্য শিক্ষালয়।' পারিবারিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য একটি সন্তানের বেড়ে ওঠার নিয়ামক শক্তি। Family Manners I Etiquette সন্তান-সন্ততির মাঝে রুচি, মননশীলতা ও মূল্যবোধ তৈরি করে। পারিবারিক ঐক্য ও বন্ধন বৃহত্তর ঐক্যের শিক্ষা দেয়। পরিবারের একজন সদস্যের ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমালোচনা শুনা ও সহ্য করার দীক্ষা পাওয়া যায়। পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞা বৃহত্তর অঙ্গনে স্থিতিশীলতা সৃষ্টির লব্ধ জ্ঞান। যৌথ পরিবার প্রথা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ হলেও পশ্চিমা সভ্যতার (Western Civilization) প্রভাবে আজ সেটি ক্ষীয়মাণ। পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক সরোকিন বর্তমান পারিবারিক ব্যবস্থার ব্যাপারে বলেন, 'পূর্বে মানুষ আনন্দ লাভ ও চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে ফিরে যেত পরিবারের নিভৃত আশ্রয়ে, কিন্তু বর্তমানে মানুষ তার জন্য চলে যায় সিনেমা-থিয়েটার নাচের আসর ও ক্লাবঘরের গীতমুখর বেষ্টনীতে। পূর্বে পরিবার ছিল আগ্রহ-ঔৎসুক্য ও আনন্দ-উৎফুল্লতার কেন্দ্রস্থল। পারিবারিক জীবনেই আমরা সন্ধান করতাম শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের নির্মলতা। কিন্তু এখন পরিবারের লোকজন হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে পারস্পরিক প্রীতি, মাধুর্য, অকৃত্রিমতা আন্তরিকতা ও পবিত্রতা। পার্থিব স্বার্থের মোহ, জীবন মান উন্নত করার প্রতিযোগিতা ও প্রবণতা আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত ঐতিহ্যকে চূর্ণ করে দিচ্ছে। কেউ কারোর ধার ধারে না, পরোয়া করে না। আপন সন্তান সন্ততির পার্থিব ও ক্যারিয়ার গঠনে মা বাবা যেন আজ নির্ঘুম ক্লান্তিহীন কারিগর। Social Status Maintain করতে গিয়ে অনেকের সন্তান-সন্ততির ইচ্ছার বিরুদ্ধে wrong decision গ্রহণ করছে। সবার মাঝে অজানা অদৃশ্য কিছু অর্জনের চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষা। পারিবারিক ও সামাজিক মিলবন্ধন আজ হারিয়ে যাচ্ছে। বিবাহের ক্ষেত্রে Arranged Marriage এর সংস্কৃতি প্রায় লুপ্ত। Affairs Marriage এর ফলে পারিবারিক বন্ধন সংস্কৃতি যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় চরমভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। একদিকে অপরিণত বয়সে বিবাহের সংখ্যা ও Love Marriage যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি ব্যাপক হারে বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটছে। ২৭ আগস্ট ২০১৮ দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, শুধুমাত্র ঢাকা শহরে প্রতি ঘণ্টায় একটি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, যেখানে ২০০৬ সালে পুরো বাংলাদেশে প্রতি হাজারে বিচ্ছেদের হার ছিল ০.৬ জন, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.১ জন। এক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিতদের হার ১.৭ জন। আর অশিক্ষিতদের হার ০.৫ জন। (সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)

বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য ২৫-২৯ বছর বয়সীরা সবচেয়ে বেশি আবেদন করছে। এক্ষেত্রে নৈতিক স্খলন, পরস্পর সন্দেহ প্রবণতা ও পরকীয়া বিচ্ছেদের মুখ্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন মনোবিজ্ঞানীরা। চট্টগ্রামেও বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের হিড়িক পড়েছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী ১৫৭৯টি বিচ্ছেদের আবেদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রতি মাসে গড়ে ৩৮৪টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। সে হিসেবে প্রতিদিন বিচ্ছেদ ঘটছে ১৫টি আর প্রতি দু'ঘণ্টায় ২/১ টিরও বেশি আবেদন জমা পড়ছে, যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। আবেদনকারীদের মধ্যে ৭০ শতাংশ নারী বিচ্ছেদের আবেদন করছে। (সূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩১ জুলাই ২০১৯)

ফলে অনেক ছেলে-মেয়ে মা বাবার অযত্নে ও অবহেলায় বেড়ে উঠছে। ভালো পরিবারে জন্ম নেয়ার পরও সামাজিক অবমূল্যায়নের শিকার হচ্ছে। পারিবারিক শিক্ষা ও Nursing এর অভাবে এবং Western Culture এর নগ্ন থাবায় আমাদের পরিবার ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণে ধরেছে। পশুত্ব বিরাজ করছে সবখানে। মনুষ্যত্ব, মানবতা, মহানুভবতা ও উদারতা আজ ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে যাচ্ছে। ফলে সমাজজীবনে যে ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা শুধু সভ্যতাকেই ধ্বংস করছে না, মনুষ্যত্ব ও মানবতাকেও দিচ্ছে প্রচণ্ড আঘাত। মাছ চাষ, পশু পালন, ক্ষেত-খামার সকল কিছুতে সফল হওয়ার জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান দরকার আর সৃষ্টির সেরা মানবসন্তান লালন পালনের জন্যও অবশ্যই পরিকল্পনা, চিন্তা ও Study প্রয়োজন। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, সহনশীলতা, লৌকিকতা ও অহঙ্কার ত্যাগ, ছেলে-মেয়ের Worldly Career এর পাশাপাশি Spiritual Career গঠনে মনোযোগী হওয়া, পরিবারের সদস্যদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, অপরের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকা, নৈতিকতার ব্যাপারে ছাড় না দেয়া, বিভিন্ন বিষয়ে Counselling করা, সন্তান-সন্ততিদের ধীরে ধীরে বুঝতে শেখানো, মাসিক পারিবারিক বৈঠক করা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পরামর্শ করা, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করতে শেখানো, Morality Development Motivation অব্যাহত রাখা, প্রত্যেকটি পরিবারকে Training Centre বানানো, সর্বোপরি মহান রবের কাছে আমাদের মুনাজাত হোক এই– "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।" (সূরা ফুরকান : ৭৪)

তবেই সম্ভব একটি প্রীতিময় পারিবারিক বন্ধন তৈরি করা। আর সেটি হোক সমৃদ্ধ ও শান্তিময় বাংলাদেশ গড়ার প্রথম প্রয়াস (First Initiative)|

লেখক : অধ্যক্ষ, দি ডাক্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম
মেইল: auadilctg@gmail.com

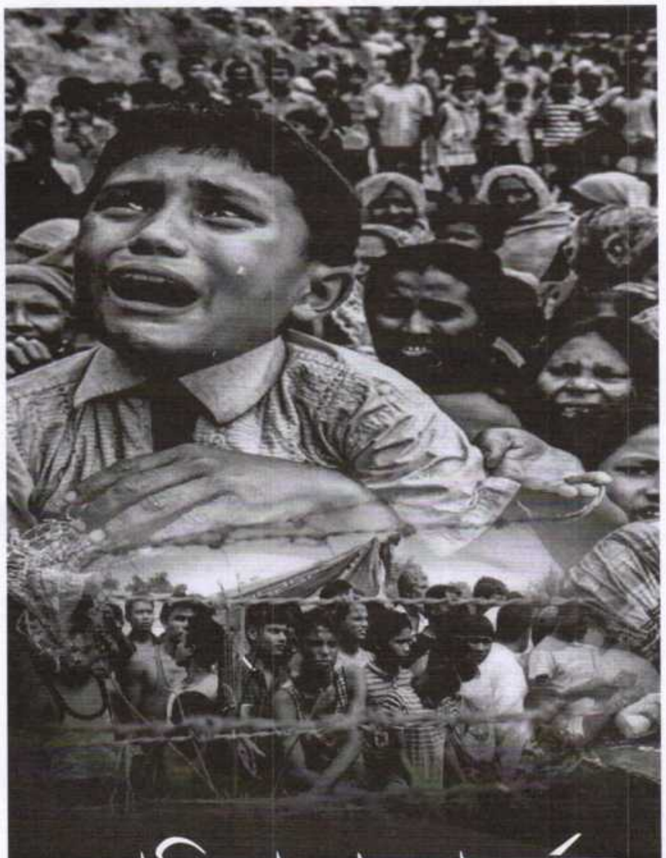

রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন সময়ের অনিবার্য দাবি

আবু সাঈদ

একটা জাতি তার দেশে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবে, তার ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার স্বাধীনভাবে পালন করবে এটা তার মৌলিক নাগরিক অধিকার। কিন্তু ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে সহিংসতার শিকার হয়ে নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রিত হওয়া অত্যন্ত মর্মপীড়াদয়ক। বিগত বছরে বিশ্বের আলোচিত, সমালোচিত ঘটনাগুলোর মধ্যে মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে ধর্মভিত্তিক সহিংসতায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের নির্যাতন এবং তারা প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। প্রায় এক বছর ধরে নিজের মাতৃভূমিতে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজের ভিটে-মাটির মায়া ত্যাগ করে রোহিঙ্গা মুসলিমরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের দেশে। সারা বিশ্বের সকল মানবাধিকারবাদী রাষ্ট্রসমূহ এমনকি খোদ জাতিসংঘের প্রচেষ্টাতেও সেখানে দেশের সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত এই মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে রাখাইনের নিরীহ মুসলমানরা প্রাণ বাঁচাতে নিজের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। মিয়ানমারের প্রধানমন্ত্রী অং সান সু কি নিজেকে নির্যাতিত মানবতার ধারক-বাহকের ধোঁয়াশা তোলে, শান্তির বুলি আওড়ে ক্ষমতায় আরোহণ করার সাথে সাথেই সকল মানবতা নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে মানবতাবিরোধী অপরাধ মুসলিম হত্যার উৎসবে মেতে উঠলো। আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায় খুন, ধর্ষণ, বসতঘরে অগ্নিসংযোগের শিকার হয়ে আশ্রয় নিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের দিকে পালাতে লাগলো। কিন্তু, আফসোসের বিষয় ছিল শুধুমাত্র মুসলিম পরিচয়ের কারণে এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানালো। এমনকি যারা কোনোভাবে বেড়া টপকে ওপারে গিয়েছিলো তাদেরকেও তারা বের করে দিয়ে হীনমন্যতা দেখাতে কার্পণ্য করেনি। তবে আমার বাংলাদেশ প্রতিবেশী হিসেবে তাদের বিপদে পাশে দাঁড়ানো, আশ্রয় দেয়াকে কর্তব্য মনে করে উদারতা দেখিয়েছি। প্রায় সাত লক্ষাধিক শরণার্থীকে আমরা আশ্রয় দিয়ে দেখভাল করছি। সীমান্তবর্তী এলাকা কক্সবাজারের কুতুপালং, বালুখালিতে শরণার্থী শিবির স্থাপন করে দিয়েছে। সরকার, বিভিন্ন এনজিও এবং দাতব্য সংস্থাগুলো ত্রাণসামগ্রী নিয়ে তাদের সাহায্যে হাজির হয়েছে। এমনকি সারাদেশের সাধারণ জনগণ নিজেদের সাধ্যানুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করে ছুটে চলেছেন শরণার্থী শিবিরগুলোতে। এই ঘটনাপ্রবাহ আমাদের সবারই জানা! সবই আমরা করেছি নিঃস্বার্থভাবে মানবতার খাতিরে। কিন্তু, বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। নিজেদের বিশাল জনসংখ্যার চাপ সামলাতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। জনগণের চাপ, চাহিদা পূরণ করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও এদেশের অন্যতম একটা নেতিবাচক দিক। সব মিলিয়ে যখন নিজেদের সমস্যাগুলো সমাধান করে সার্বিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা কষ্টকর হয়ে যায়, সম্ভাবনার দিকগুলো ক্ষীণ দেখায় তখন প্রায় সাত লক্ষ বহিরাগত লোকের ভরণ-পোষণ না হোক অন্তত দেখভাল করাটাও কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়! অথচ আমরা সর্বতোভাবে তাদের সাহায্য করে যাচ্ছি। তাদের জন্য ঘর তৈরি থেকে শুরু করে ন্যূনতম চাহিদা পূরণেও সচেষ্ট। এমনকি আমাদের দেশের সামরিক বাহিনীও সেখানে শ্রম দিচ্ছেন। প্রায় পনেরো মাস ধরে তারা বাংলাদেশে আছে। কিন্তু একটা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পক্ষে আর কতদিন এই ভার বহন করা? তাই যখনই এই সঙ্কট থেক উত্তরণের জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে আলোচনা হচ্ছে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা হচ্ছে তখনও মিয়ানমার সরকার নির্লজ্জভাবে তা এড়িয়ে চলছে। এমনকি রোহিঙ্গাদেরকে তারা বাংলাদেশের জনগণ বলতেও দ্বিধা করেনি। শান্তির পায়রা অং সান সু কি কতটা নির্লজ্জ আর বেহায়া হলে বিশ্বে এই অশান্তি ছড়িয়ে তা দীর্ঘস্থায়ী রাখার হীন প্রয়াস চালাতে পারে? জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যস্থতায় যখন তারা তাদের জনগণ ফেরত নিতে রাজি হলো সেখানেও একটা সংখ্যা ধরিয়ে দিলো। সবাইকে একসাথে না নিয়ে কিস্তিতে নিবে। আমরা যেন উদারতা, মানবতা দেখাতে গিয়ে নতুন বিপদ ঘাড়ে নিলাম! না পারছি রাখতে, না পারছি ফেলতে। যদিও রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়া, শরণার্থী হিসেবে রাখা কিংবা ফেরত দেয়া নিয়ে বিভিন্নজন বিভিন্ন মন্তব্য করে একেক রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন। আমাদের দেশের জনগণ আবার একটু বেশিই রাজনীতি প্রিয়। রাজনীতিঘেঁষা জনগণ আবার সকল বিষয়কে রাজনৈতিক অঙ্গনে ফেলে বিচার করতে ভালোবাসেন। দেশের মাথায় যখন বাড়তি বোঝা তখনও অনেকেই আবার এই মন্তব্য করতেও ছাড়েননি যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নোবেল পুরস্কার পাওয়ার লোভে আশ্রয় দিয়ে দেখভাল করছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি নোবেল পাননি তাই পরেরবার পাওয়ার লোভে রোহিঙ্গাদেরকে ফিরত না পাঠিয়ে রেখে দিচ্ছেন। কি হাস্যকর ব্যাপার? আফসোস হয় এই জাতির জন্য। অন্তত আমার মনে হয় না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্তব্যকারীদের মতো এতটাই বোকা ও মূর্খ। আমার মতো আনাড়ি জনতার এই মন্তব্য করা যতটা সহজ একটা

দেশ চালানো কিংবা এতবড় একটা জনসংখ্যাকে আশ্রয় দিয়ে তাদের ভরণ-পোষণ করা ততটা সহজ হলে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ডটি এতদিনে পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র খ্যাত ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়ে যেতো বলেই আমার মনে হয়। যেহেতু রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া এগোচ্ছে সেহেতু উক্ত আনাড়ি রাজনৈতিক মন্তব্যের ব্যাপারে কিছু না বলাই উত্তম। এবার যদি মূল প্রসঙ্গ অর্থাৎ রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন নিয়ে কিছু বলি সেখানেও খুব ভালো একটা আশার দিক এখনো দেখতে পাচ্ছি না। জাতিসংঘ কর্তৃক সেনাবাহিনীর সহায়তায় রোহিঙ্গাদের নিবন্ধন করে স্মার্টকার্ড তৈরির একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ঠিক। কিন্তু তাতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই বাধা খোদ রোহিঙ্গারাই। জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমার ফিরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাটি সামনে রেখে কার্ড করার পদ্ধতিটি হাতে নিয়েছে। কিন্তু, তারা এই কার্ড তৈরি করতে অনাগ্রহী। আজ লিখতে বসার আগে প্রত্যাবর্তন চুক্তি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখলাম। গত ২৩ শে নভেম্বর আল জাজিরা একটা রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, তাদের ভয় যে আইডি সিস্টেম তাদেরকে জোরপূর্বক ফিরত পাঠানোর ঝুঁকিতে ফেলবে! কারণ নিবন্ধন করতে সৈন্যরা চাপের কৌশল প্রয়োগ করে বলে তাদের অভিযোগ। তারা ভয় পায় যদি তাদের জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তিত করা হয় এবং মিয়ানমার সরকারের সাথে তাদের বায়োমেট্রিক তথ্য ভাগ করে নেয়া হয়? এক বছরের বেশি সময় ধরে তারা হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং সামরিক অভিযান থেকে পালিয়ে এসে একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে আর ফিরত যেতে চাচ্ছে না। ঠিক আগের দিনও আল জাজিরার পাবলিক অপিনিয়নে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নাসির উদ্দিন লিখেছেন, রোহিঙ্গা সংকটে একমাত্র খেলোয়াড় বাংলাদেশ আসলেই প্রত্যাবর্তন চায়। কিন্তু, এই প্রক্রিয়াটি ব্যর্থতা বা ধ্বংসের দিকেই যাচ্ছে। অর্থাৎ তার মন্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান, রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন নিয়ে মিয়ানমারের কোনো আগ্রহ নাই। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ একা তা নিয়ে করছে। কেননা গত অক্টোবরে রাখাইন রাজ্যের যেখানে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয়েছে, সেই দিদির গ্রামের প্রশাসক কিউ. সো. মো. ব্রিটিশ সংবাদপত্র দি গার্ডিয়ানকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছে, সে বিশ্বাস করে না মুসলমানরা ফিরে আসবে। এও বলেছে, কেউ সন্ত্রাসীদের ফিরিয়ে আনতে চায় না। কি উগ্র দাম্ভিকতা? কতটা নির্যাতন করে ভয় ধরিয়ে দিলে এমন জোর দিয়ে বলা যায় যে তারা ফিরে আসবে না? আমরা তো মিয়ানমারের বৌদ্ধদের মাঝে রোহিঙ্গাদেরকে ফিরত নেয়ার চরম অনাগ্রহ দেখছিই। কিন্তু যারা স্বদেশ ফেলে এখানে এসেছে তারা? নিজেদের ভিটে-মাটি ফিরে পেতে তারাই বা কতটা আগ্রহী? এখানে এসে এতটাই সমাদর পেয়েছে যে খোদ নির্যাতিতরাই নিজের ঘরে ফিরতে চাচ্ছে না? তারা আশঙ্কা করছে ফিরে যাওয়ার পর তারা আবার নির্যাতনের শিকার হবে। যার ফলে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হতে চলেছে। রোহিঙ্গারা নিজেদের দেশকে মৃত্যুর কূপ আখ্যা দিচ্ছে। ঘোষণা করছে তারা আর ঐ মৃত্যুর কূপে পা রাখতে চায় না। সংকট কতটা গভীর হয়ে গেছে তা সহজেই অনুমেয়। বেশির ভাগ শরণার্থীই দেশে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। যার ফল আমরা দেখতে পেয়েছি গত ১৫ নভেম্বর। চুক্তি অনুযায়ী ২২০০ জন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর প্রথম গ্রুপ বাংলাদেশ ছেড়ে মিয়ানমার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, তারা সেখানে না যাওয়ার জন্য 'ন যাইয়ুম, ন যাইয়ুম' বলে বিক্ষুব্ধ শ্লোগান দিলে প্রক্রিয়াটি স্থগিত হয়ে যায়। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কি বাংলাদেশেরও কোনো দায় নাই? অবস্থা এমন, আমরা তো বলছি, না গেলে কি করবো! আমি অবাক হলাম গত ১৫ নভেম্বর এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, শরণার্থীদের ত্রাণ ও প্রত্যাবর্তনের দায়িত্বে থাকা কমিশনার আবুল কালাম বলেছেন, আমরা কাউকে ফিরে যেতে বাধ্য করব না। যারা স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে চাইবে শুধুমাত্র তাদেরকেই পাঠাবো। কি আশ্চর্যজনক উদার বক্তব্য ভাবা যায়? যেখানে নিজেদের অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়ে যাচ্ছে। রোহিঙ্গারা কর্ম খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন অবৈধ অপরাধের সাথে জড়িয়ে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এমনকি গত ১৫ মে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দেখলাম শরণার্থী ক্যাম্পে বিশ মাসে রোহিঙ্গা শিশু জন্ম হয়েছে দেড় লক্ষ এবং আরো পঁয়ত্রিশ হাজার রোহিঙ্গা নারী গর্ভবতী! আরো প্রায় দুই লক্ষ শরণার্থী বেড়ে গেলো এই কয়দিনে। অথচ আমাদের কর্তাদের যেন এ নিয়ে কোনো ভাবান্তরই নাই। দেশের এত বড় একটা সংকট থেকে উত্তরণের কোনো দায় নাই মনে হয়! আন্তর্জাতিক মহল শরণার্থীদের ফিরিয়ে সংকট থেকে উত্তরণের চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেখানে দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির কথাবার্তায় যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব। সবকটা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম যখন রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন চুক্তি বিফলের সম্ভাবনা দেখছে। সবাই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জোরালো ভূমিকা দেখাচ্ছে ঠিক তখনই পথের কাঁটা হয়ে বিবৃতি দেয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ নামের এক বেসরকারি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। তাদের ভাষ্যমতে যতক্ষণ মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করছে ততক্ষণ যেন ফেরত পাঠানো না হয়। এ জন্য জাতিসংঘসহ প্রভাবশালী দেশগুলো যেন বাধা দেয়। তাদের মতে জাতিসংঘ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর উচিত প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার জোরালো প্রতিবাদ করা। একদিক থেকে তাদের বিবৃতি একেবারে ফেলে দেয়ার মতোও নয়। কিন্তু এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তো বাংলাদেশ নিতে পারবে না। যেই দায়িত্ব বোঝা হয়ে ঘাড়ে চেপেছে তার ভারই তো বয়ে চলা সম্ভব হচ্ছে না। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উচিত সেখানে পরিদর্শন করে জরিপ চালানো। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এত কথা, আলোচনা-সমালোচনা, আশার দিক আবার প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা, ধীরগতি সব মিলিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটাই যেন ব্যর্থ! তাহলে এই সমস্যার সমাধান কী? সঙ্কট থেকে উত্তরণের উপায় কী? আমার মতো আনাড়ি জনগণ তো আর এর সমাধান দিতে পারবে না। কিন্তু, আমরা চাই দেশের পরিচালকদের সঠিক ও যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার দ্রুত সমাধান। বাংলাদেশের মতো জনসংখ্যার চাপে নুয়ে পড়া একটা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পক্ষে এতবড় একটা জনগোষ্ঠীর দীর্ঘস্থায়ী লালন করা যে সম্ভব নয় সেটা আন্তর্জাতিক মহলে জোরালো ও কার্যকর আলোচনা করতে হবে। সাথে চাই রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফিরে যেতে যে অনাগ্রহ ও অনীহা তৈরি হয়েছে তা ভেঙে নিজের ভিটেতে ফিরে যেতে আগ্রহী করে তোলার কার্যকর পদক্ষেপ। জাতিসংঘ ও অন্যান্য প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের সহায়তা নিয়ে সঙ্কট উত্তরণে আরো ভূমিকা রেখে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করতে হবে। সেই সাথে অত্যাবশ্যক বিষয় হলো পররাষ্ট্রনীতির সমৃদ্ধি ও মজবুতীকরণ করতে হবে। আর সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের বেফাঁস কথাবার্তা বন্ধ করে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। স্বদেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার জন্য এই সংকট সমাধান অত্যাবশ্যক। রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন এখন সময়ের অনিবার্য দাবি। আমরা যারা আমজনতা, আমরা উদারতা দেখাতে চাই, কিন্তু আগে নিজে বেঁচে! চাই সমস্যা ও সঙ্কটবিহীন সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

লেখক : শিক্ষার্থী ও কলামিস্ট, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ

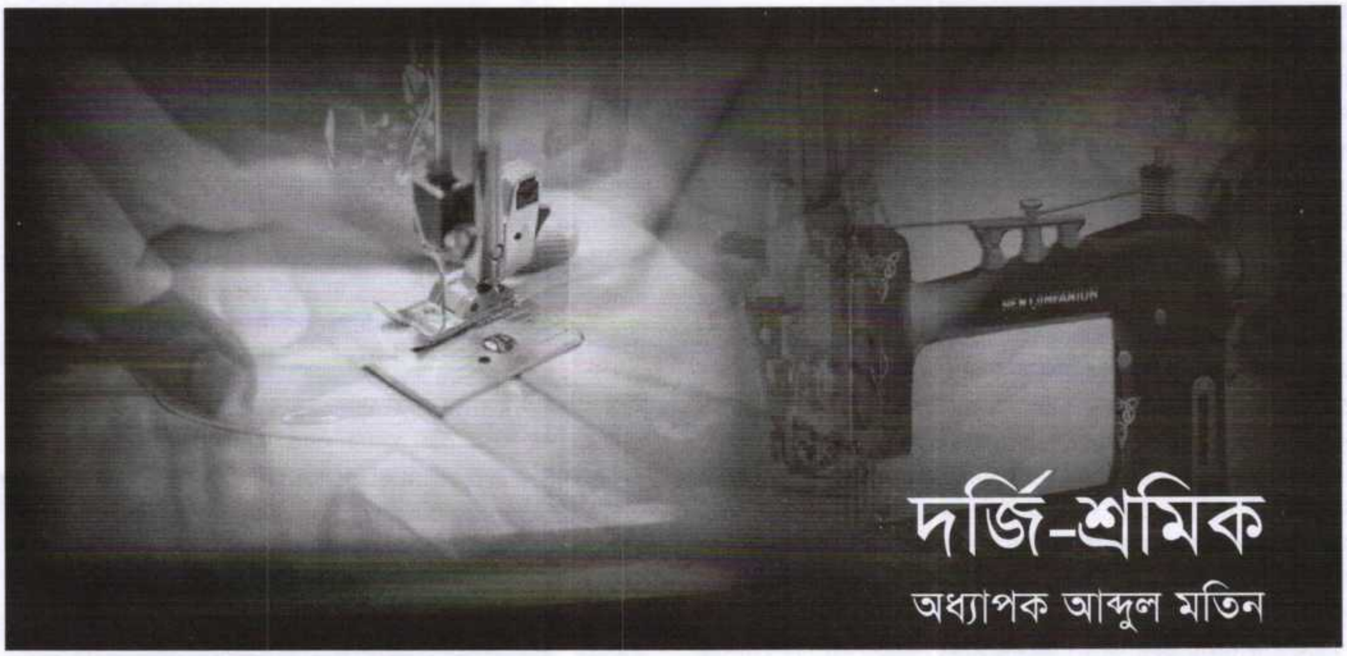

দর্জি-শ্রমিক

অধ্যাপক আব্দুল মতিন

দর্জি-শ্রমিকের পরিচয়: দর্জি শব্দটি ফারসি শব্দ। দর্জি বলতে সাধারণত পোশাক তৈরি, কাপড় সেলাই, রিপু ও কাপড় মেরামত করা যার পেশা তাকেই বুঝায়। এর সমার্থক শব্দ সূচিক কর্মজীবী, ইংরেজিতে ঞধরষড়ৎ। আরবিতে খইয়্যাত। তবে আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে দর্জির পরিবর্তে খলিফা শব্দই বেশি ব্যবহৃত হয়। এদিক দিয়ে দর্জির আরেক সমার্থক অর্থ খলিফা। ব্যবহারিক অর্থে আমরা খলিফা তাদেরকে বলি যারা পেশাদারভাবে পোশাক তৈরি করেন, মেরামত করেন, পোশাকের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন। তবে ইংরেজি ঞধরষড়ৎ শব্দ ল্যাটিন শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ কাপড় কাটা, জামা কাপড় মেরামত করা, তৈরি করা এবং সমন্বয় করা, নির্দিষ্ট নিয়মাবলি অনুসরণ করে কিছু তৈরি করা ও মেরামত করা।

দর্জি একটি সম্মানিত পেশা : খলিফা শব্দটি কোন সময় হতে আমাদের দেশে প্রচলিত হল তার সন তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার পর বেশ কিছু আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে ফলে সেই সময় হতে খলিফা শব্দ এদেশে চালু হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। খলিফা শব্দটি কোরআনের শব্দ এবং খুব মর্যাদাবান শব্দ। এই মর্যাদাবান শব্দটি দর্জিদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে একদিকে দর্জি সমাজকে মর্যাদায়িত করা হয়েছে। খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। একজন প্রতিনিধি সব সময় তার মালিকের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আদেশ আহকামের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, তার নিজের কোনো ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার মূল্য থাকে না। তদ্রূপ একজন দর্জি গ্রাহকের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পোশাক তৈরি করে দেয় তার নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না। শুধু গ্রাহকের ইচ্ছার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে দেয় তাই হয়ত তাকে খলিফা বলা হয়। এটি আমার ব্যক্তিগত অভিমত। মানুষ পৃথিবীতে পোশাক পরে আসে না। কিন্তু জন্মের পর প্রথমত পোশাকের মাধ্যমে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। এরপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে এমন হয় যে পোশাক ছাড়া সে সমাজে বাস করতে পারে না। তার এই পোশাক বানিয়ে দেয় দর্জি বা খলিফা। জ্ঞান বাড়ার সাথে সাথে লজ্জাও বাড়ে। ফলে একদিকে লজ্জা নিবারণ অন্যদিকে নিজেকে সমাজের নিকট আকর্ষণীয়, সুন্দর ও ব্যক্তিত্বময় করে গড়ে তোলার জন্য সুন্দর নিত্যনতুন পোশাকের প্রয়োজন হয়। তার এই পোশাক তৈরি করে দেয় দর্জি। সৃষ্টির সেরা জীব আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ তার সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ করে সভ্য মানুষ হিসেবে সমাজে বাস করে পোশাক পরে। আর একজন দর্জির মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়।

দর্জি শ্রমিকের মর্যাদা : দর্জি পেশার অতীব মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহর নবী হযরত ইদ্রিস (আ) পেশায় একজন দর্জি ছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী (সা) নিজে জামা কাপড় সেলাই করতেন। কপড়ে জোড়াতালি দিতেন। রাসূলে করিম (সা) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে খোলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবা কেরামগণও তাদের জীবনে এর নমুনা রেখেছে। তারা নিজেরা নিজেদের জামা কাপড় সেলাই করেছেন এবং জোড়া তালি দিয়েছেন। সাহাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী যুগে সুফি সাধকগণও নিজেদের কাপড় নিজে সেলায় করা কিংবা জোড়া তালি দেয়ার কাজ নিজেই করেছেন। এমনকি দিল্লির বাদশা হারুনুর রশিদ নিজে টুপি সেলাই ও জামা সেলাই এর অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

সুঁই সুতার কাজ ও ইসলামের শিক্ষা: দর্জি নামক পেশার এই কাজটির সম্পর্ক সুঁই সুতার সাথে। আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে 'যার নাই রাগ সে করুক সুই সুতার কাজ'। রাগ থাকলে সহজে কেউ এ কাজটি করতে পারে না। রাগ হজম করা বড় কঠিন কাজ। রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি যুদ্ধে জয়ী হলো সে প্রকৃত বীর নয় বরং সেই প্রকৃত বীর যে তার রাগ হজম করতে পারে। আর একজন দর্জির সাথে রাসূল (সা)-এর এই হাদিসটির চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একজন দর্জি শ্রমিক তার শত রাগ হজম করে ক্ষুদ্র একটি সুচের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে সুতা ভরার কাজটি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সম্পন্ন করে। এ কাজের মাধ্যমে একজন মানুষ ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা পায়। একজন গ্রাহক যখন ছেঁড়া ফাটা কাপড় রিপু করার জন্য নিয়ে আসে তখন একজন দর্জি সেই কাপড় রিপু করে সুন্দর করে দেয়া তার নিজের দায়িত্ব মনে করে। এ কাজের মাধ্যমে তার সুন্দর মন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের ঘুণেধরা বিশৃঙ্খল এ সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলার

জন্য একজন দর্জির মতো সুন্দর মন মানসিকতা সম্পন্ন লোকের বড় প্রয়োজন। একখণ্ড কাপড় টুকরো টুকরো করে কেটে সুন্দর অবয়ব দিয়ে নতুন করে পোশাক তৈরি করার যে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা তা একমাত্র দর্জি শ্রমিকের মধ্যেই পাওয়া যায়। একটি সুন্দর সুখী সমৃদ্ধশালী ও কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার অতীব প্রয়োজন। একজন দর্জি ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

পোশাকশ্রমিক ও দর্জিশ্রমিকের পার্থক্য: পোশাক শিল্প বলতে পোশাক কারখানায় বৃহদায়তনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পোশাক উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। পোশাকশ্রমিক সাধারণত ঢাকা শহর ও দেশের বড় শহরগুলো যেখানে বড় বড় কারখানা আছে। সেখানে তারা কর্মরত রয়েছে। তাদের মজুরি, আবাসন, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, নিরাপদ পানি, নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশনসহ বহুবিদ সমস্যা রয়েছে। দর্জিদের মতো কাপড়ের মাপ নিয়ে তারা পোশাক তৈরি করে না। নির্দিষ্ট কিছু মাপ, সুতা ও মেশিনের ব্যবহার করে তারা কাজ করে। এ পেশায় প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত আছে। অপর দিকে গ্রাম- গঞ্জে শহরে বন্দরে জেলা শহর ও বিভাগীয় শহরে হাজার হাজার দর্জি শ্রমিক কাপড় তৈরি, মেরামত ও রিপুর কাজ করে। তাদের সংখ্যা কোনো অংশেই পোশাক শ্রমিক এর চেয়ে কম নয়। বরং বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। পোশাক শ্রমিক ও দর্জি শ্রমিকের কাজের ধরন ও মজুরির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় শুধুমাত্র দর্জি শ্রমিকের সমস্যার কথা আলোচনা করা হলো।

দর্জি শ্রমিকের সমস্যা: (১) প্রচলিত বাম রাজনীতির ধারা: দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে বাম ধারার রাজনীতি শ্রমিক সমাজের মাঝে কিছুটা হলেও প্রভাব বিস্তার করে আছে। বাম ধারার শিক্ষা হলো মালিক শ্রমিক একে অপরের শত্রু। জ্বালাও-পোড়াও তাদের রাজনীতির মূল হাতিয়ার। মালিকের চামড়া খুলে জুতা বানানো তাদের শ্লোগান। দীর্ঘদিন ধরে বাম ধারার নেতাদের এই ঘৃণ্য প্রচার ও কূটকৌশলের কারণে মালিক ও শ্রমিকের মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ফলে একে অপরের ভাই বা বন্ধুর পরিবর্তে মালিক ও দাস এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্কের পরিবর্তে যান্ত্রিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

(২) চিকিৎসা সমস্যা: একজন দর্জি শ্রমিক সুই সুতার কাজ করতে করতে বয়সের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছে। সুঁই সুতার কাজ করার কারণে তার মাথায় ব্যথা হয়, চোখে কম দেখে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্ধ হয়ে যায়। এই অন্ধ শ্রমিকের চোখের চিকিৎসার জন্য দর্জি মালিক, সরকারি, বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না, যা সত্যিই খুবই দুঃখজনক।

(৩) ঈদ বোনাসের সমস্যা: একজন দর্জি শ্রমিক গ্রাহককে ঈদের আনন্দ দেওয়ার জন্য চাঁদ রাত পর্যন্ত কাজ করে গ্রাহককে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ করে দেয় এবং মালিকগণও অর্থনৈতিকভাবে প্রচুর লাভবান হয়। রাত দিন সমানভাবে তারা পরিশ্রম করে কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম করার জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রদান করা হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই মজুরি দেয়া হয়ে থাকে। ফলে ঈদ মৌসুমেও খুব বাড়তি তারা আয় করতে পারে না। ফলে একজন দর্জি শ্রমিকের ভাগ্যে ঈদের আনন্দ জোটে না। আজ পর্যন্ত কোন মালিক কোন দর্জি শ্রমিককে খুশি হয়ে ঈদের বোনাস হিসাবে কোন অর্থ দেয়নি। এটা কত বড় অমানবিক বিষয় তা ভাবতেই অবাক লাগে।

(৪) মৌলিক চাহিদা হতে তারা বঞ্চিত: একজন দর্জি শ্রমিক তার মালিকের অধীনে বছরের পর বছর কাজ করে হাজার হাজার গ্রাহকের পোশাক বানিয়ে দেয়। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে যখন তার আর কাজ করার মতো ক্ষমতা থাকে না তখন তার আর কেউ খোঁজখবর নেয় না। সারাজীবন ধরে যে ব্যক্তি অন্যের লজ্জা নিবারণ করার কাজটি করে আসল বৃদ্ধ বয়সে অর্থের অভাবে ইজ্জত ঢাকার মতো কাপড়ও সে পায় না। এমনকি কোন কোন শ্রমিকের কাফনের কাপড় চাঁদা তুলে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। একজন দর্জি শ্রমিকের কর্মের মাধ্যমে মালিকগণ বড় বড় অট্টালিকা গড়ে তোলে। তাদের ছেলে-মেয়েদের বিদেশে লেখাপড়া করায়। কিন্তু দর্জি শ্রমিকের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় না। তাদের ছেলে মেয়েদের ভালো কোন স্কুলে লেখা পড়া করারও ব্যবস্থা হয় না।

নিয়োগপত্র সমস্যা: একই মালিকের অধীনে একজন দর্জি শ্রমিক পনেরো বিশ বছর কাজ করার পরও তারা নিয়োগপত্র পায় না। অনেক সময় রাত্রের বেলায় কাজ সেরে বাসায় ফেরার সময় পথে ঘাটে পুলিশি হয়রানির শিকার হয়। সে সময় মালিক পক্ষ কোন দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে না কিংবা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে না। সে সময় একমাত্র আল্লাহকে ডাকা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকে না।

কাজের পরিবেশগত সমস্যা: কারখানাগুলোতে কাজ করার মতো স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। নিরাপদ পানি, নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন এবং কাজের সুষ্ঠ পরিবেশ এর যথেষ্ট অভাব।

সুপারিশ:(ক) মালিক ও শ্রমিকের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ও অংশীদারির ভিত্তিতে কারখানা পরিচালনা ও কাজের পরিবেশ তৈরি করা।

(খ) অতিরিক্ত কাজের মজুরি যা স্বাভাবিক কাজের চেয়ে বেশি দেওয়া।

(গ) প্রতিটি কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ তৈরি করা।

(ঘ) নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) এক মাসের কাজের সমপরিমাণ মজুরি বোনাস হিসাবে ঘোষণা করা ও দুই ঈদে দুইটি বোনাস চালু করা।

(চ) আহত হলে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা।

(ছ) বয়স্কভাতা এবং কাজ শেষে এককালীন অর্থ প্রদান করা।

(জ) মাঝে মধ্যে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং অন্ধ শ্রমিকদের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

(ঝ) অংশীদারের ভিত্তিতে কাজের সুযোগ প্রদান করা।

(ঞ) সর্বোপরি সরকারি বেসরকারি সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা।

(ট) মালিক ও শ্রমিকের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক ধারণাগত সমস্যা দূর করে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং কারখানায় কাজের পরিবেশ তৈরি করা।

লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, রাজশাহী বিভাগ পূর্ব

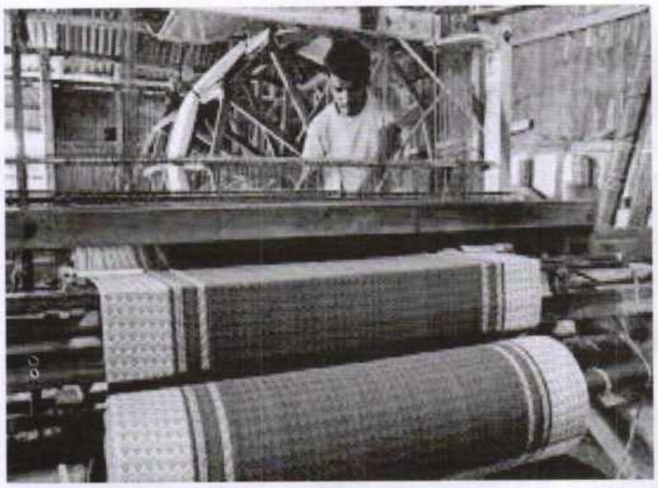

তাঁত শিল্প

হস্তচালিত তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। ২০০৩ সালের তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার ৪০% জোগান দিয়ে থাকে তাঁত শিল্প। এ শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে এর স্থান কৃষি ও গার্মেন্টস শিল্পের পরেই তৃতীয় বৃহত্তম এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অনন্য। ২০০৩ সালে দেশব্যাপী পরিচালিত তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান ১,৮৩,৫১২টি তাঁত ইউনিটে মোট হস্তালিত তাঁতের সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬টি। তন্মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ৩,১১,৮৫১ টি এবং বন্ধ তাঁতের সংখ্যা ১,৯৩,৭০৫টি। তাঁত কি? তাঁত হচ্ছে এক ধরনের যন্ত্র যা দিয়ে তুলা বা তুলা হতে উৎপন্ন সুতা থেকে কাপড় বানানো হয়। তাঁত বিভিন্ন রকমের হতে পারে। খুব ছোট আকারের হাতে বহনযোগ্য তাঁত থেকে শুরু করে বিশাল আকৃতির স্থির তাঁত দেখা যায়। আধুনিক বস্ত্র কারখানাগুলোতে স্বয়ংক্রিয় তাঁত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত তাঁত নামক যন্ত্রটিতে সুতা কুণ্ডলী আকারে টানটান করে ঢুকিয়ে দেয়া থাকে। যখন তাঁত চালু করা হয় তখন নির্দিষ্ট সাজ অনুসারে সুতা টেনে নেয়া হয় এবং সেলাই করা হয়। তাঁতের আকার এবং এর ভেতরের কলাকৌশল বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বাংলা তাঁত যন্ত্রে ঝোলানো হাতল টেনে সুতো জড়ানো মাকু (spindle) আড়াআড়ি ছোটানো হয়। তাঁতি: 'তাঁত বোনা' শব্দটি এসেছে 'তন্ত্র বয়ন' থেকে। তাঁত বোনা যার পেশা সে হল তন্তুবায় বা তাঁতী। আর এই তাঁতের উপর যারা বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে তাদেরকে ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ার বলা হয়। এক কথায় হাত ও পায়ের সাহায্যে প্রথাগত তাঁতযন্ত্র পরিচালনা করে সুতি বস্ত্র তৈরির কারিগরকেই তাঁতি বলে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য কাপড়ের চাহিদা পূরণের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। চর্যাপদেও তাঁতিদের জীবনযাপন ও কাজের ধরনের বর্ণনা আছে। এর থেকে বোঝা যায় প্রাচীন বাংলায় এই শৈল্পিক পেশা ছিল। তাঁত শিল্পের ইতিহাস : ইতিহাস থেকে জানা যায়, আদি বসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিরাই হচ্ছে আদি তাঁতি অর্থাৎ আদিকাল থেকেই এরা তন্তুবায়ী গোত্রের লোক। এদেরকে এক শ্রেণীর যাযাবর বলা চলে- শুরুতে এরা সিন্ধু অববাহিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে এসে তাঁতের কাজ শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়ায় শাড়ির মান ভালো হচ্ছে না দেখে তারা নতুন জায়গার সন্ধানে বের হয়ে পড়েন, চলে আসেন বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে। সেখানেও আবহাওয়া অনেকাংশে প্রতিকূল দেখে বসাকরা দু'দলে ভাগ হয়ে একদল চলে আসে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, অন্যদল ঢাকার ধামরাইয়ে। তবে এদের কিছু অংশ সিল্কের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজশাহীতেই থেকে যায়। ধামরাইয়ে কাজ শুরু করতে না করতেই বসাকরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভাগ হয়ে অনেক বসাক চলে যান প্রতিবেশী চৌহাট্টা অঞ্চলে। এর পর থেকে বসাক তাঁতিরা চৌহাট্টা ও ধামরাইয়া এ দুই গ্রুপে স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তা ছাড়া তাঁত শিল্পের ইতিহাস থেকে আরো জানা যায় যে মনিপুরীরা অনেক আদিকাল থেকে বস্ত্র তৈরি করে আসছে। মনিপুরীদের বস্ত্র তৈরির তাঁতকল বা মেশিন প্রধানত তিন প্রকার যেমন, কোমরে বাঁধা তাঁত, হ্যান্ডলুম তাঁত ও থোয়াং। এই তাঁতগুলো দিয়ে সাধারণত টেবিল ক্লথ, স্কার্ফ, লেডিস চাদর, শাড়ি, তোয়ালে, মাফলার, গামছা, মশারি ইত্যাদি ছোট কাপড় তৈরি হয়। প্রধানত নিজেদের তৈরি পোশাক দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেই মনিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁত শিল্প গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে তাঁত শিল্পে নির্মিত সামগ্রী বাঙালি সমাজে নন্দিত ও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে নকশা করা ১২ হাত মনিপুরী শাড়ি, নকশি ওড়না, মনোহারী ডিজাইনের শীতের চাদর বাঙালি মহিলাদের শৌখিন পরিধেয়। আগেকার দিনে হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে তাঁতবস্ত্র তৈরি করার জন্য চরকা বা সুতাকাটার চাকু ব্যবহার করা হতো। আজকাল পর্যাপ্ত পরিমাণে সুতা মেশিনে তৈরি হচ্ছে, পরিণতিতে চরকা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। এখন বয়নকারীরা শুধু নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারোপযোগী চলতি মানের সস্তা গামছা, গেঞ্জি, লুঙ্গি এবং শাড়ি প্রস্তুত করছেন। তাঁতিরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এখন একান্তই পরিবারকেন্দ্রিক। তারা গ্রামের যে অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এর নাম তাঁতিপাড়া। দেশের কিছু অঞ্চল যেমন নরসিংদী, রায়পুরা, ডেমরা, টাঙ্গাইল, শাহজাদপুর, বেড়া, কুমারখালী, রুহিতপুর, বাবুরহাট, গৌরনদী এবং নাসিরনগর বয়নকার্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। কাপড়ের গুণগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায় অঞ্চলভিত্তিক কাপড় উৎপাদনে। রাজশাহীর সিল্ক, টাঙ্গাইল এবং পাবনার সুতি শাড়ি, মিরপুরের কাতান এবং জামদানি, ডেমরার বেনারসি এবং নরসিংদীর লুঙ্গি, গামছার খ্যাতি আছে সারাদেশব্যাপী। এসব স্থান এখনও ব্যাপক পরিমাণে কাপড় রপ্তানি করছে। বর্তমানে বস্ত্রকলে তৈরি কাপড় তাঁতবস্ত্রের বাজার সহজেই দখল করে নিয়েছে এবং এতে করে তাঁতীরা পড়ছে বিপাকে। বৈধ ও অবৈধভাবে আমদানিকৃত কাপড় পরিকল্পিত ও সুব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে তৈরি হওয়ার ফলে সেগুলোর ডিজাইন, মান ও গুণ তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের। উন্নতমানের এ পণ্যের সাথে হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড় প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য ডিজাইন ও ব্যবসায়ী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা দরকার, তার কোন ব্যবস্থা নেই। তাঁত বস্ত্রের ডিজাইন উন্নত আকর্ষণীয় ও বহুমাত্রিক করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারের অভাব তাঁতীদের অবস্থান আরো দুর্বল করে দিয়েছে। তাঁতশিল্প এখনো সিংহভাগ মানুষের জন্য বস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে। সে প্রেক্ষিতে এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগরদের জন্য পেশাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। পরিবর্তিত রুচি ও পছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁত বস্ত্রেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগা প্রয়োজন। কিন্তু সেজন্য যে সামর্থ্য থাকা দরকার সাধারণ তাঁতী সমাজের তা নেই। তাই তাদেরকে সনাতনী পদ্ধতিতেই ও সনাতনী মানের বস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে। এ অবস্থা তাঁত শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের তাঁতীদের তৈরি জামদানি, বেনারসি, গরদ, টাঙ্গাইল শাড়ি, খদ্দর, লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি, টুপি, সালোয়ার কামিজ, হ্যান্ডলুম, পিট লুম, ফ্রেমলুম, জাপানিলুম, চিত্তরঞ্জনলুম, বেনারসিলুম, জামদানিলুম বিশ্বব্যাপী যেমন কদর রয়েছে তেমনি চাহিদাও। অতীতে এবং বর্তমানে তাঁত শিল্পে উৎপাদিত পোশাক রপ্তানি করা হচ্ছে বিশ্ববাজারে যা আমাদের দেশীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে। তা ছাড়া দেশের বাইরে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে যা আমাদের জন্য আশার বাণী।

সংগ্রহ : বিলস

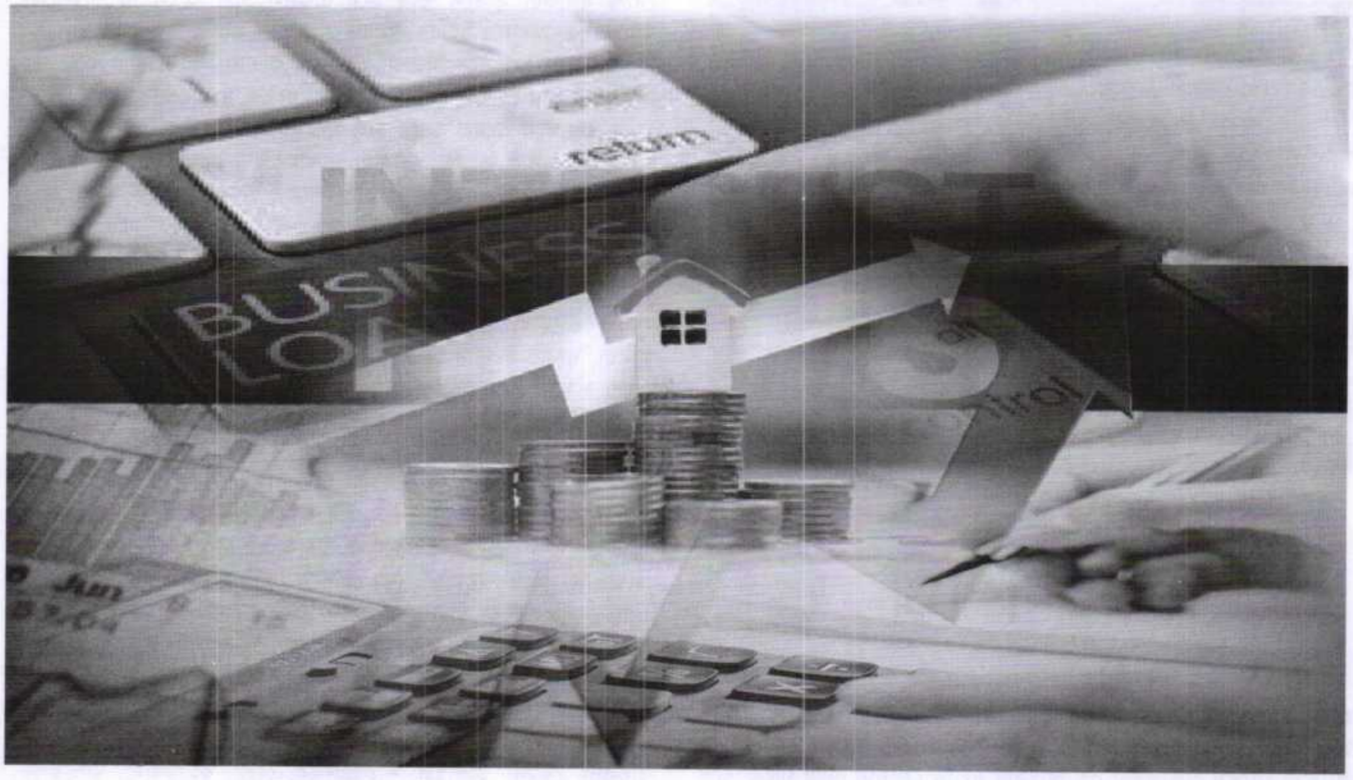

সকল ধর্মেই সুদ নিষিদ্ধ

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

সাম্প্রতিককালে ইসলামিক ফাইন্যান্সবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে সম্মানিত স্কলারগণ প্রচলিত ব্যাংকের সুদকে হারাম জ্ঞান করেই এর বিকল্প হিসেবে মানুষের জীবনকে সহজতর ও আরামদায়ক করার লক্ষ্যে 'প্রয়োজনীয়তার স্তর তত্ত্বের' (Theory of levels of necessities) আলোকে মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিন স্তরে ভাগ করে (স্তরগুলো হলো- জরুরিয়াত বা অত্যাবশ্যকীয়, হাজিয়াত বা প্রয়োজনীয় ও তাহসিনিয়াত বা সৌন্দর্যবর্ধক) নতুন নতুন শরিয়াহ প্রোডাক্টের আইডিয়া বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন, যা পরবর্তীতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবে গ্রহণযোগ্য, সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়ে থাকে। সুপ্রাচীন কাল থেকে দুনিয়ায় আসমানি ধর্ম হিসেবে প্রচারিত সকল ধর্মেই সুদ নিষিদ্ধ ছিল। তাই সুদ প্রতিটি ধর্মেই হারাম। ইহুদি, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও সুদ নিষেধের বর্ণনা এসেছে পরিষ্কারভাবে। পাকিস্তানের সাবেক বিচারপতি ওয়াজিউদ্দিন আহমদ বলেছেন, 'বেবিলনীয় যুগে (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০-১৭১২) হাম্বুরাবি সংহিতায় সুদ লেনদেন সংক্রান্ত দৃষ্টান্তের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত এর অনুকূলে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, ধর্মীয় অনুমোদন ছিল না। তবে হিন্দুধর্ম (মনুসংহিতা) এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মে সুদকে হয় নিয়ন্ত্রণ করা হতো, না হয় রীতিমাফিক তা নিষিদ্ধ ছিল।' তিনি আরো মন্তব্য করেছেন এভাবে, 'মানব সভ্যতা যতটা পুরাতন সুদের ধারণাটিও ততটাই প্রাচীন। সুদের ওপর আল-কুরআনের নিষেধাজ্ঞা কার্যত আহলি কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ওপর এই বিষয়ে পূর্ব থেকে আরোপিত ও প্রযোজ্য বিধিনিষেধের ধারাবাহিকতা মাত্র।' Exodus- ২২:২৪ (তাওরাত) এ বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি আমার কোন লোককে অর্থ ধার দাও যারা গরিব, তবে তোমরা তার কাছে সুদগ্রহীতার ন্যায় হয়ো না এবং তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবে না'। Proverbs-২৮ : ৮তে বলা হয়েছে 'যে সুদ এবং অন্যায় উপার্জনের দ্বারা তার সম্পদ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে, সে তা নিজের জন্য পুঞ্জীভূত করে যা দরিদ্রের দুর্দশা বাড়ায়।' Leviticus: ২৫:৩৫-৩৭ তে বলা হয়েছে 'If your brother meets with difficult times, you shall give him shelter and lodging, though he be a stranger or a sojourner, that he may live with you. Do not exact from him any interest (riba) over and above that which you have spent on himv. You have the anger of God to fear. See to it that your brother has freedom to live with you. It is not permissible for you to receive interest (riba) on that you spend, or what write off'. খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ The Gospel of St. Luke এ বলা হয়েছে, Land, hoping for nothing againÕ (ধার দাও, তার বিনিময়ে কিছু আশা না করে)। হিন্দুধর্মে 'মনু' এর (২য় শতাব্দী এডি) বিধিমালায় সুদের লেনদেন অবৈধ বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু সমাজে একটি প্রবাদ চালু ছিল যে, 'নগচ্ছেৎ শুন্ডিকায়লং'; অর্থাৎ সুদখোরের বাড়িতে যেয়ো না। বৌদ্ধ ধর্মেও সুদকে ঘৃণা করা হয়েছে এবং সুদখোরদের 'ভণ্ড তপস্বী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'Hypocrical ascetics are accused of practicing it.' প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্ল্যাটো তার

'লজ' নামক পুস্তকে সুদকে মানবতাবিরোধী, অন্যায় ও জুলুম এবং কৃত্রিম ব্যবসা বলে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছেন।' প্ল্যাটোর শিষ্য অ্যারিস্টোটলও কঠোর ভাষায় সুদের নিন্দা ও বিরোধিতা করেছেন। তিনি অর্থকে বন্ধ্যা মুরগির সাথে তুলনা করেছেন যা ডিম দিতে পারে না। তিনি তার পলিটিকস শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, 'The most hated sort (of wealth), and with the greatest reason, is usury, which makes gain out of money itself, and from the natural objects of it. For money was intended to be used in exchange, and not increase at interest of all modes of getting wealth, this is the most unnatural.' সুদ মানবতার জন্য একটি জঘন্য অভিশাপ। সুদের অশুভ কালো হাত বা অনিষ্ট কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এর কুফল ও ধ্বংসকারিতা মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। ইসলাম কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিল দ্বারা সুদকে হারাম করেছে এবং নিষিদ্ধ করণে অতি কঠোরতা দেখিয়েছে। এতে কোন চিন্তাবিদের চিন্তা কিংবা ইজতিহাদের সমর্থকের মন্তব্যের কোন স্থান নেই, কারণ যে বিষয়টি অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হয় তাতে ইজতিহাদ চলে না। সুদের ভয়াভহ পরিণতি জানতে একজন মুসলমানের জন্য সূরা বাকারার শেষের দিকের আয়াতগুলো পাঠ করাই যথেষ্ট। আয়াতে কারিমায় নিহিত ভীতি প্রদর্শনের ভয়াবহতা ও শাস্তিদানের হুমকির তীব্রতায় তার বুকের মাঝে অবস্থিত হৃদয় বেরিয়ে যাবার উপক্রম হবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এ জন্য সে তারা বলে ক্রয় বিক্রয় তো সুদের মতই, অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নির অধিবাসী সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃজ্ঞ পাপীকে ভাল বাসেন না। আর যদি তোমরা সুদ না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের (জন্য প্রস্তুত হও) ঘোষণা দাও। (আল কুরআন -২: ২৭৫-২৭৬) অসংখ্য হাদীসে রাসূল (সা.) সুদের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে সুদ খায়, যে খাওয়ায়, যে লেখে, যে সাক্ষী– সবাই অভিশপ্ত (তিরমিজি, আবু দাউদ)। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'মিরাজের রজনীতে আমি সপ্ত আকাশে পৌছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনি, বিকট ও প্রকট শব্দ শুনতে পেলাম। অতঃপর আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট এলাম যাদের পেট ছিল একটি ঘরের ন্যায় বিস্তৃত। তাদের পেট ছিল সর্পে ভরপুর। সর্পগুলো বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন এরা হলো সুদখোর সম্প্রদায়।' (আহমদ, ইবনে মাযাহ) রাসূল (সা.) আরেকটি হাদীসে বলেছেন 'সুদের ভিতর সত্তরটি গুনাহ রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গোনাহ হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য।' (মেশকাত শরীফ) তিনি আরো বলেছেন, জেনেশুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশ বার জেনা করার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ (বায়হাকি ও ইবনে মাযাহ)। আরেকটি হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (মুসতাদরাকি হাকীম) তিনি আরো বলেছেন, 'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুদ সমৃদ্ধি আনে, কিন্তু সুদের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে অভাব ও সংকোচন। (মুসনাদে আহমদ) আরবি পরিভাষায় যাকে 'রিবা' ইংরেজিতে যাকে Usury/interest, উর্দু, ফার্সি এবং বাংলায় তাকে 'সুদ' বলা হয়ে থাকে। সুদকে ব্যবহারিক বাংলায় 'কুসিদ'ও বলা হয়। আরবি 'বিরা' শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- প্রবৃদ্ধি, বাড়তি, অতিরিক্ত, বিকাশ, সম্প্রসারণ, বিনিময় ছাড়া বৃদ্ধি প্রভৃতি। ইসলামে ঐ বৃদ্ধিকে 'বিরা' বলা হয় যা প্রদত্ত ঋণের উপর ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত ধার্য করে আদায় করা হয়। ড. ওমর চাপরা লিখেছেন, 'রিবা সেই অতিরিক্তকে বুঝায় যা ঋণের শর্ত হিসেবে অথবা ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির দরুণ ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে তার প্রদত্ত ঋণের আসলসহ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়।' প্রাথমিক যুগ থেকেই মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ 'রিবা'কে সর্বসম্মতভাবে এই অর্থেই বুঝে আসছেন। আধুনিক কালে ইসলামী আইনবেত্তাদের বেশ কয়কটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে, মুতামার আল-ফিকহ আল-ইসলামীর উদ্যোগে ১৯৫১ সালে প্যারিসে এবং ১৯৬৫ সালে কায়রোতে, ওআইসি ও রাবেতা ফিকহ কমিটির উদ্যোগে ১৯৮৫ সালে কায়রোতে এবং ১৯৮৬ সালে মক্কায় উল্লেখযোগ্য। এসব সম্মেলনসহ ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আগে

সুদ মানবতার জন্য একটি জঘন্য অভিশাপ। সুদের অশুভ কালো হাত বা অনিষ্ট কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এর কুফল ও ধ্বংসকারিতা মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। ইসলাম কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিল দ্বারা সুদকে হারাম করেছে এবং নিষিদ্ধ করণে অতি কঠোরতা দেখিয়েছে। এতে কোন চিন্তাবিদের চিন্তা কিংবা ইজতিহাদের সমর্থকের মন্তব্যের কোন স্থান নেই, কারণ যে বিষয়টি অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হয় তাতে ইজতিহাদ চলে না।

ইসলামী বিশ্বের ভেতরে ও বাইরের বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে বিশেষ বৈঠক, মিটিং, কনফারেন্স, সেমিনার ও সম্মেলন করা হয়েছে। সব সম্মেলনেই 'রিবা' সম্পর্কে উক্ত রূপ রায় দেয়া হয়েছে এবং ব্যাংকের মুনাফা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকলের অকাট্যভাবে ঐকমত্য পেশ করা হয়েছে। সুতরাং এ কথাও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ব্যাংকের মুনাফাই হারাম, ঘোষিত সুদ। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল-কারযাভি বলেন, 'সব সময় আমার এ কথাও স্মরণ হয় যে কিভাবে শাহ আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে তিনশরও বেশি অর্থনীতি ও আইন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ স্কলার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন, তাদের মধ্যে একজনও ব্যাংকের মুনাফা হারামে দ্বিমত পোষণ করেননি; বরং সকলেই এ থেকে রক্ষা পাওয়ার আবশ্যিকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের পরিকল্পনা পেশ করেন। এরই বরকতময় পরিণতি হলো ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুদি ব্যাংকের শরয়ী বিকল্প আবিষ্কার।' বর্তমানে সুদের বৈধতার জন্য যে সব যুক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে তন্মধ্যে বলা হয়ে থাকে কুরআনুল কারীম যে সুদকে হারাম করেছে তা হলো চক্রবৃদ্ধি সুদ। স্বল্প পরিমাণ সুদ যেমন ৮% বা ১০% এগুলো নিষিদ্ধ সুদের আওতায় পড়ে না। এটা মূলত গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্থাপিত সন্দেহ, কুরআনুল কারীমের সূরা আলে-ইমরানে বর্ণিত আয়াতে এর সামান্যতম মুনাফা বাদ দেয়ার দাবি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না, আল্লাহকে ভয় কর, যেন সফল হতে পার। (সূরা আলে-ইমরান : ১৩০) আরবি ভাষার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং আরবি ভাষা সম্বন্ধে যাদের কিঞ্চিৎ ধারণা রয়েছে তারা জানে যে "রিবা" শব্দটির বিশেষণ (চক্রবৃদ্ধি হারে) শুধুমাত্র বাস্তবতা ও এর ভয়াবহতার বীভৎস চিত্র তুলে ধরার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সেকালের আরব উচ্চহারে চক্রবৃদ্ধি সুদ গ্রহণের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিল। এ ধরনের বিশেষণ শর্ত হিসেবে ধর্তব্য হবে না সুতরাং চক্রবৃদ্ধি না হলে যে তা বৈধ হবে এমনটি নয়। এটার উদাহরণ হলো যেমন আজকাল বলা হয়ে থাকে বিনাশী মাদকের মোকাবেলা কর যা মানুষকে সমূলে ধ্বংস করছে। এখানে মাদকের বিশেষণ 'বিনাশী' বাস্তবতার বর্ণনা যা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং সমগ্র ভয়াবহতা ছাড়িয়ে গেছে, এ কথা বলার কারণে নিষেধাজ্ঞা ও প্রতিরোধ হতে কোন প্রকার মাদককে বাদ রাখা উদ্দেশ্য নয়। বরং হতাশাব্যঞ্জক বাস্তবতার বীভৎস চিত্র ও ভয়াবহতার কথা বলা হয়েছে যেন সকলে মিলে সর্ব প্রকার মাদকতার মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করার জন্য কাজ করে। ইসলামে কোন বস্তু হারাম ঘোষিত হওয়ার পদ্ধতি হলো বেশিতে পতিত হওয়ার আশঙ্কার কারণে কম হতে নিষেধ করা এবং বিপর্যয়ের হাওয়া প্রবাহিত হতে পারে সে সন্দেহে দরজাই বন্ধ করে দেয়া।

সমগ্র মানবতার উপর ইসলামের অনুগ্রহ হলো যে ইসলাম সুদকে সাবলীল ভাষায় হারাম করেছে। বিকৃত তৌরাতের মত বলেনি, যে ইহুদিদের পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ গ্রহণ হারাম তবে অ-ইহুদিদের সাথে লেনদেনে সুদ দেয়া-নেয়া বৈধ। ইসলাম, মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে লেন-দেনে সুদ দেয়া-নেয়া উভয়টাকেই হারাম করেছে। ইসলাম দ্বিমুখী কথা ও দ্বৈতরীতি অবলম্বন করার সুযোগ দেয়নি। সুদ কার্পণ্য, স্বার্থান্ধতা, হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অসৎ গুণাবলী মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে। সুদ বিভিন্ন জাতির মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করে। মানুষের মধ্যকার সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইমাম রাযী তার তাফসিরে লিখেছেন, 'কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই সুদ লোকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। সুদের মাধ্যমে অর্থাগমনের উপর নির্ভরশীলতা মানুষকে পরিশ্রম করে উপার্জন করা থেকে বিমুখ ও অনুৎসাহী বানিয়ে দেয়।' সুদের বিকল্প হচ্ছে অধুনা ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স। ইসলামী ব্যাংকিং এমন একটি সুদের কারবারহীন কৌশল ও পরিচালনা, যা ব্যবসায়িক উদ্যোগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইসলামী শরিয়াহ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে এ ব্যাংকের সকল লেনদেন সুদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সেই সাথে আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও মানুষের সার্বিক উন্নয়ন এ ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য। এ ব্যাংকব্যবস্থায় পরিচালিত প্রকল্পগুলো সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথাই চিন্তা করে না; বরং সামাজিক এবং নৈতিক উন্নয়নের ওপরও গুরুত্বারোপ করে। গত বছরের ২৬-২৭ অক্টোম্বর মালয়েশিয়ার 'কুয়ালালামপুর কনভেনশনাল সেন্টারে' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংকিং কনফারেন্স' (আইআইবিসি-২০১৪)। মালয়েশিয়ার অর্থমন্ত্রী আহমদ হুসনি মুহাম্মদ হানাযিলাহ, উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেছিলেন, 'Malaysia's success in the development and expansion of Islamic Finance is undisputed. We are proud to have been a pioneer in many areas of Islamic Finance.' সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধর্মের চার শতাধিকেরও অধিক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও শরিয়াহ স্কলার উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। মালয়েশিয়ার 'ব্যাংক রাকাত' কর্তৃপক্ষ তাদের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সম্মেলনটির আয়োজন করেন। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্সের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং সম্ভাবনা উপস্থিত স্কলারগণ একবাক্যে স্বীকার করেন, উক্ত অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ায় অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সম্মেলনের অর্থমন্ত্রীর চমৎকার বক্তৃতা, ইসলামী ফাইন্যান্স এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে তার অগাধ পাণ্ডিত্য, আমাদের প্রতি তার অকৃত্রিম আন্তরিকতা সর্বোপরি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং প্রশংসা, সত্যিই অতুলনীয়। ইসলামিক ফাইন্যান্স মানব জীবনের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিককে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আজকের 'মালয়েশিয়া'। সামগ্রিক ব্যাংকিংয়ের ১৮ শতাংশ ধারণ করে মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং দুনিয়াব্যাপী শরিয়াহ ব্যাংকিংয়ের অন্যতম কেন্দ্রভূমির (Hub) পরিচিতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরো ২% এগিয়ে রয়েছে। অপার সম্ভাবনাময় এ দেশ অগ্রগামী পাঁচ স্বল্পোন্নত দেশের একটিতে পরিণত হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত হয়েছে উদীয়মান এগারো দেশের কাতারে। হতে যাচ্ছে মাধ্যম আয়ের দেশে। এমতাবস্থায় মালয়েশিয়ার মতো আমরাও যদি আলাদা ইসলামী ব্যাংকিং আইন, শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ফাইন্যান্স বিশ্ববিদ্যালয়, সুকুক গবেষণা, উচ্চমানের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গবেষকদের যথার্থ মূলায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স-মাস্টার্স, এমফিল-পিএইচডি, কিংবা ডিপ্লোমা পর্যায়ে ইসলামিক ব্যাংকিং/ফাইন্যান্স/ইন্স্যুরেন্স সাবজেক্ট চালু প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের সম্ভাবনাময় বাজারকে সমৃদ্ধ করতে পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা আশাবাদী যে আমাদের অর্থমন্ত্রী সুদের সাফাই গাওয়া ও ইসলামী ব্যাংকের পরিবর্তে সংসদে কিংবা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দাঁড়িয়ে মালয়েশিয়ার অর্থমন্ত্রীর মতো বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন 'ইসলামিক ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সফলতা বিতর্কের উর্ধ্বে। আমরা ইসলামিক ফাইন্যান্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ায় গর্ববোধ করছি।'

লেখক : ইসলামি চিন্তাবিদ।

ডেঙ্গু হলে আতঙ্ক নয় হাতের কাছেই আছে প্রতিরোধের সহজ উপায়

ডেঙ্গু জ্বর একটি এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাসজনিত গ্রীষ্মকালীন রোগ। এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সচরাচর ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গগুলো দেখা দেয়। উপসর্গগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, বমি, পেশিতে ও গাঁটে ব্যথা এবং গাত্রচর্মে ফুসকুড়ি। দুই থেকে সাত দিনের মাঝে সাধারণত ডেঙ্গু রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগটি মারাত্মক রক্তক্ষরী রূপ নিতে পারে যাকে ডেঙ্গু রক্তক্ষরী জ্বর (ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার) বলা হয়। এর ফলে রক্তপাত হয়, রক্ত অণুচক্রিকার মাত্রা কমে যায় এবং রক্ত প্লাজমার নিঃসরণ ঘটে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কখনোবা ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম দেখা দেয়। ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোমে রক্তচাপ বিপজ্জনকভাবে কমে যায়। কয়েক প্রজাতির এডিস মশকী (স্ত্রী মশা) ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রধান বাহক। যেগুলোর মধ্যে এডিস ইজিপ্টি মশকী প্রধানতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে ডেঙ্গু একটি বৈশ্বিক আপদে পরিণত হয়েছে। এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশের ১১০টির অধিক দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হয়। প্রতি বছর পাঁচ থেকে পঞ্চাশ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে সংক্রমিত হয় এবং তাদের মাঝে দশ থেকে বিশ হাজারের মতো মারা যায়। ১৭৭৯ সালে ডেঙ্গুর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বিংশ শতকের প্রথমভাগে ডেঙ্গুর ভাইরাস উৎস ও সংক্রমণ বিশদভাবে জানা যায়। মশক নিধনই বর্তমানে ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়। সরাসরি ডেঙ্গু ভাইরাসকে লক্ষ্য করে ওষুধ উদ্ভাবনের গবেষণা চলমান রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশটি অবহেলিত গ্রীষ্মকালীন রোগের একটি হিসেবে ডেঙ্গু চিহ্নিত করেছে। আমাদের দেশে মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস, বিশেষ করে গরম ও বর্ষার সময় ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বেশি থাকে। এ বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে ডেঙ্গু জ্বর বেশি হচ্ছে। শীতকালে সাধারণত এই জ্বর হয় না বললেই চলে। শীতে লার্ভা অবস্থায় এই মশা অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। বর্ষার শুরুতে সেগুলো থেকে নতুন করে বংশবিস্তার করে থাকে। ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধী টিকা কয়েকটি দেশে অনুমোদিত হয়েছে তবে এই টিকা শুধু একবার সংক্রমিত হয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর। মূলত এডিস মশার কামড় এড়িয়ে চলাই ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়। তাই মশার আবাসস্থল ধ্বংস করে মশার বংশবিস্তার প্রতিরোধ করতে হবে। এ জন্য এডিস মশার বংশবিস্তারের উপযোগী বিভিন্ন আধারে, যেমন, কাপ, টব, টায়ার, ডাবের খোলস, গর্ত, ছাদ ইত্যাদিতে আটকে থাকা পানি অপসারণ করতে হবে। শরীরের বেশির ভাগ অংশ ঢেকে রাখে এমন পোশাক পরিধান করতে হবে। ডেঙ্গু জ্বর হলে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে এবং বেশি করে তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে। ডেঙ্গুতে মৃত্যুর অন্যতম কারণ রক্তে প্লাটিলেট কমে যাওয়া। রক্তে প্লাটিলেট বা অণুচক্রিকা রক্তজমাটে সাহায্য করে। ২০ হাজারের নিচে প্লাটিলেটের সংখ্যা নেমে এলে কোনো প্রকার আঘাত ছাড়াই রক্তক্ষরণ হতে পারে। কোনো কারণে রক্তে প্লাটিলেট কমে গেলে জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনার মাধ্যমেই প্লাটিলেটের সংখ্যা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিছু খাবার আছে যেগুলো প্লাটিলেট বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। আসুন জেনে নেই সেসব খাবারের নাম।

পেঁপে এবং পেঁপে পাতা: পেঁপে খুব দ্রুত রক্তের প্লাটিলেটের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম। মালয়েশিয়ার এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজির একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডেঙ্গু জ্বরের কারণে রক্তে পাটিলেটের পরিমাণ কমে গেলে পেঁপে পাতার রস তা দ্রুত বৃদ্ধি করে। রক্ত প্লাটিলেটের পরিমাণ কমে গেলে প্রতিদিন পেঁপে পাতার রস কিংবা পাকা পেঁপের জুস পান করুন।

মিষ্টি কুমড়া এবং কুমড়া বীজ: মিষ্টি কুমড়া রক্তের পাটিলেট তৈরি করতে বেশ কার্যকর। এ ছাড়াও মিষ্টি কুমড়াতে আছে ভিটামিন 'এ' যা প্লাটিলেট তৈরি করতে সহায়তা করে। তাই রক্তের প্লাটিলেটের সংখ্যা বাড়াতে নিয়মিত মিষ্টি কুমড়া এবং এর বীজ খেলে উপকার পাওয়া যায়।

লেবুর রস: লেবুর রসে প্রচুর ভিটামিন 'সি' থাকে। ভিটামিন সি রক্তে প্লাটিলেট বাড়াতে সহায়তা করে। এ ছাড়াও ভিটামিন 'সি' শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলে। ফলে প্লাটিলেট ধ্বংস হওয়া থেকেও রক্ষা পায়।

আমলকী: আমলকীতেও আছে প্রচুর ভিটামিন 'সি'। এ ছাড়াও আমলকীতে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে। ফলে আমলকী খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং পাটিলেট ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

অ্যালোভেরার রস: অ্যালোভেরা রক্তকে বিশুদ্ধ করে। রক্তের যেকোনো সংক্রমণ দূর করতেও অ্যালোভেরা উপকারী। তাই নিয়মিত অ্যালোভেরার জুস পান করলে রক্তের প্লাটিলেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ডালিম: ডালিম রক্তে পাটিলেটের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এতে প্রচুর আয়রন রয়েছে যা পাটিলেট বৃদ্ধি করে। প্রতিদিন ১৫০ মিলিলিটার ডালিমের জুস দুই সপ্তাহ পান করুন। ডালিমের রসের ভিটামিন দুর্বলতা দূর করে কাজে শক্তি দেবে।

ডেঙ্গু হলে সবার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ীই ওষুধ কিংবা অন্য কিছু সেবন করা বাঞ্ছনীয়।

সংগ্রহ : ইন্টারনেট

ফেডারেশন সংবাদ

লিডারশীপ ট্রেনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

নৈতিক মানসম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের মাধ্যমে ইনসাফপূর্ণ শ্রমনীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব

– অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার। ট্রেড ইউনিয়ন হলো শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের একটি সংগঠন, যার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষ তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার তুলে ধরতে পারে এবং তা আদায় ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনে লড়াই ও সংগ্রাম করতে পারে। কিন্তু নৈতিকতাসম্পন্ন নেতৃত্ব না থাকায় ট্রেড ইউনিয়নের প্রকৃত সুফল শ্রমিকরা পাচ্ছে না। তাই আগামী দিনে মেহনতি মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে ইনসাফপূর্ণ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের অপরিহার্য হাতিয়ার হিসেবে নৈতিক মানসম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। গত ২৫ ও ২৬ আগষ্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত লিডারশীপ ট্রেনিং ক্যাম্পে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় ট্রেনিং ক্যাম্পে ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রম আইন, শ্রমিক আন্দোলন, সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা ডাঃ শফিকুর রহমান, অধ্যাপক তাসনীম আলম, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, মাওলানা এটিএম মাসুম, নুরুল ইসলাম বুলবুল, মাওলানা এ এইচ এম আব্দুল হালিম ও ড. ছামিউল হক ফারকী, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী ও মজিবুর রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ। নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, দফতর সম্পাদক আবুল হাশেম, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিন। মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, একদিকে মালিকরা মনে করেন ট্রেড ইউনিয়ন করলেই ঝামেলা পোহাতে হবে, অপর দিকে শ্রমিকদের ধারণা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন হলেই বড় নেতা হয়ে গেলাম। মূলত ট্রেড ইউনিয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পারস্পরিক অধিকার নিশ্চিত করা। শ্রমিকরা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে আর মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা সঠিক ভাবে বুঝিয়ে দিবে। এর মাধ্যমে স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথ ত্বরান্বিত হবে। এটি না হলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তিনি আরো বলেন, সৎ নেতৃত্ব ছাড়া কোনোভাবেই শ্রমজীবী মানুষের ইনসাফপূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাসূল (সা.) এর পথ অনুসরণ করে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নের প্রয়াসে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল শ্রমিক অঙ্গনে পৌছে দেয়া সম্ভব। উক্ত লিডারশীপ ট্রেনিং ক্যাম্পে দেশের বিভিন্ন জেলা ও মহানগরীর বাছাইকৃত নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ফেডারেশনের বিভাগ ও মহানগরী সভাপতিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

ঈদুল আজহার পূর্বেই শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দিয়ে দিন

– অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, সকল শিল্প কল-কারখানার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ঈদুল আজহার পূর্বেই দিয়ে দিন, যাতে করে শ্রমিকরা তাদের পরিবার নিয়ে ঈদ উৎসব করতে পারে। প্রতি বছরই কিছু কিছু মালিক ঈদের আগে শ্রমিকদের বোনাস এবং বেতন ভাতা নিয়ে টালবাহানা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেন। বেশির ভাগ গার্মেন্টস মালিকই শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দেয় না, দিলেও তা হয় ইচ্ছামাফিক। এতে কারখানার শ্রমিকদের অমানবিক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। ফলে শ্রমিকরা তাদের পরিবার নিয়ে ঈদ উৎসব থেকে বঞ্চিত হয়। যেটা আমাদের কারো কাম্য নয়। গত ৩ আগস্ট শনিবার ফেডারেশনের বিভাগ ও মহানগরী সভাপতিদের বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে মালিকদের প্রতি তিনি এই আহবান জানান। বৈঠকে সকল বিভাগ ও মহানগরীর সভাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রব্বানী, মাস্টার শফিকুল আলম, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কবির আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, ফখরুল ইসলাম, ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন

সিদ্দিকী, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, দফতর সম্পাদক আবুল হাসেম, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, দেশের বর্তমান অবস্থায় সকলের পক্ষে ঈদের আনন্দ যথাযথভাবে উপভোগ করা সম্ভব হবে না। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি দরিদ্র ও কম আয়ের মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিয়েছে। পানি, জ্বালানি তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের তীব্র সঙ্কট জনজীবনে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে ভয়াবহ বন্যায় দেশের মানুষের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ফসলহারা কৃষকরা অর্ধাহারে-অনাহারে ক্ষুধায় হাহাকার করছে। তাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সামগ্রী ও নগদ অর্থ সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন। তিনি কৃষকদের জন্য খাদ্যদ্রব্যসহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিনামূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা সামগ্রী ও বিনা সুদে কৃষিঋণ প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান। সেই সাথে সব সচ্ছল, দানশীল ব্যক্তি, সাহায্য সংস্থা এবং বিশেষ করে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে দুর্গত এলাকার জনগণের পাশে সাহায্য- সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ানোর জন্য আহবান জানান।

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

দুর্নীতি অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় ধ্বংস হচ্ছে রেলওয়ে খাত।

–অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

গত ৫ জুলাই বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ (বিআরইএল) এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম পাটোয়ারীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আবুল হাসেম। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন দাতা সংস্থা, পরিবহন ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও নষ্ট রাজনীতিবিদেরা রেল খাতকে ধ্বংস করেছে। মেরুদন্ডহীন অকালপক্ক সিস্টেমের কারণে বছরের পর বছর ধরে রেল লোকসানি খাত হয়ে থাকার পেছনে রয়েছে, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও জনবল সংকট অন্যতম। স্বাধীনতার ৪৯ বছরে রেলের উন্নয়নে প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রকল্পের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে যা এখনো হচ্ছে। শুধু রেলকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়ে নেয়া হয়েছে একের পর এক নানা পরিকল্পনা। এসব প্রকল্প ভবিষ্যতে কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য হবে সেদিকে লক্ষ না রেখে শুধু প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর প্রকল্প কাজের নামে খরচ দেখিয়ে অসাধু রেল কর্মকর্তা, কর্মচারী, নেতা আর ঠিকাদাররা মিলে প্রকল্পের টাকা ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছে। তাই অবিলম্বে রেলের সকল প্রকার দুর্নীতি বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান, দ্রুততম সময়ের মধ্যে সারা দেশের ব্রিজ সংস্কার অথবা সেখানে ব্রিজ পুনঃনির্মাণ করে রেলের আধুনিকায়ন, রেললাইনের ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বের করে তার সংস্কার করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানান। পরে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের সম্মতিক্রমে সরকারের কাছে ১২ দফা দাবি জানানো হয়ঃ ১. পদ্মা সেতুর শুরুতে সংযোগ রেলপথসহ ঢাকা-মংলা ও ঢাকা-বরিশাল রেলপথ নির্মাণ করতে হবে ২. লাকসাম-ঢাকা কর্ড রেলপথ, বগুড়া- জামতৈল, দোহাজারী- কক্সবাজার রেলপথ, ষোলশহর বাইপাসহ প্রস্তাবিত সকল রেলপথ বাস্তবায়ন করতে হবে। ৩. নিরাপত্তা ও দ্রুত গতির স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ লেবেল ক্রসিং সমূহের আন্ডারপাস ও ওভারপাস চালু করতে হবে ৪. পাহাড়তলী, সৈয়দপুর, কল- কারখানাসমূহের আধুনিকায়ন করে ইঞ্জিন কোচ ও ওয়াগন সংযোজনের কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে ৫. রেলের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্দরে হেন্ডেলকৃত কন্টেইনারের ৫০% রেলের মাধ্যমে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে ৬. পেনশন ৯০% এর স্থলে ১০০% এবং গ্রাচ্যুইটি প্রতি টাকায় ২৩০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা করতে হবে ৭. রেলের পতিত জায়গাসমূহে মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হোটেল মোটেল ও আবাসন প্রকল্প নির্মাণ করে রেলের আয় বৃদ্ধি করতে হবে ৮. প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজে ৪০% কোটা নির্ধারণপূর্বক ৫০% রেয়াতি হারে রেলের পোষ্যদের অধ্যয়নের সুবিধা দিতে হবে ৯. এলএম, এএলএম, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ, অফিস সহকারী, মেডিক্যাল স্টাফ, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ও অফিস সহায়কদের ন্যায্য দাবিসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে ১০. শূন্য পদের বিপরীতে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেলে পোষ্যদের চাকরি নিশ্চিত করতে হবে। ট্রাফিক স্টাফ, রানিং স্টাফ, স্টেশন মাস্টার ও অন্যান্যদের পদ সমূহের অনুকূলে আদালতের রায় অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে ১১. নিয়োগে ঘুষ বাণিজ্য বন্ধ করে মেধার ভিত্তিতে দিতে হবে। ১২. বিআরইএল এর পেশকৃত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

পরিবহন শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় বলিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন প্রয়োজন।

–মিয়া গোলাম পরওয়ার

পরিবহন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে সব রকম দলাদলি ও মতভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। একই সঙ্গে অসৎ নেতৃত্ব উচ্ছেদ করে সুষ্ঠু ও গঠনমূলক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। গত ৩১ আগস্ট শুক্রবার পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত শ্রমিক প্রতিনিধি কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, এইচ এম আতিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ নুরুল হক, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মোশাররফ হোসেন চঞ্চল। ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, গাজীপুর মহানগরীর সভাপতি খান মোহাম্মদ ইয়াকুব প্রমুখ। পরিবহন খাতের কথা তুল ধরে প্রধান অতিথি আরো বলেন, এ খাতকে ২০০৬ সালের শ্রম আইনের অধীনে আনা হলেও শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাদের টার্গেট দেওয়া হয় এতগুলো ট্রিপ দিতে হবে। এতগুলো প্যাসেঞ্জার নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণভাবেই বেআইনি। যা পৃথিবীর সব দেশে নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, সড়ক পরিবহনে যথাযথ আইনের প্রয়োগ এবং সড়ক পরিবহনে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে শ্রম আইনের বাস্তবায়ন এবং পরিবহন শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সৎ নেতৃত্বের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

রূপনগর চলন্তিকা বস্তিতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সামর্থ্যবানদের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে

– অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

মিরপুরের চলন্তিকা বস্তিতে গত ১৬ আগস্ট শুক্রবার রাতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের সহযোগিতায় সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সামর্থ্যবানদের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রূপনগর চলন্তিকা বস্তিতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মহিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রোগ্রামে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান, লস্কর মোঃ তসলিম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলী বাসার, শ্রমিক নেতা আব্দুল কাদের, আব্দুল মান্নান, ইসমাইল প্রমুখ। তিনি আরো বলেন, অগ্নিকান্ডের পর থেকে হাজার হাজার মানুষ খোলা আকাশের নিচে অর্ধাহারে, অনাহারে, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন ও অশ্রুসিক্ত নয়নে দিনাতিপাত করছে। এই দুঃসময়ে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত, সর্বস্বান্ত ও আশ্রয়হীনদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় আমরা অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা লাঘবে সব ধরনের সহযোগিতা করতে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি স্মরণকালের এই ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে আন্তরিকভাবে মর্মাহত হন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও সমবেদনা জানান। তিনি দ্রুত অগ্নিনির্বাপণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্টদের অতিদ্রুত পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করার আহ্বান জানান। পরে নেতৃবৃন্দ অগ্নিকা-ের ক্ষয়ক্ষতি সরেজমিন দেখতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, পরিদর্শনকালে সাধারণ মানুষসহ ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের সাথে একান্তে কথা বলেন। তিনি এ বিপদে মনোবল না হারিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর ভরসা রেখে ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ক্ষতিগ্রস্তদের পরামর্শ দেন এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের যথাসম্ভব সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ঢাকা অঞ্চল দক্ষিণের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

শ্রমিক অধিকার রক্ষায় মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক তৈরি করে ট্রেড ইউনিয়নের কাজকে এগিয়ে নিতে হবে

– মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, আধুনিক সমাজের উন্নয়নে শিল্পকারখানায় স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখতে, শিল্পকারখানাগুলোতে মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনা এবং উভয়ের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ দুই শ্রেণির সমঝোতা খুব জরুরি। ট্রেড ইউনিয়নগুলো মূলত মালিক-শ্রমিকের সুসম্পর্ক এবং উৎপাদনে গতিশীলতা আনার জন্যই বেশি দরকারি। তাই শ্রমিক অধিকার রক্ষায় মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক তৈরি করে ট্রেড ইউনিয়নের কাজকে এগিয়ে নিতে হবে। গত ২১ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা অঞ্চল দক্ষিণের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভায় তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা অঞ্চল পরিচালক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, আব্দুস সালাম, নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি ড. আজগর আলী, নরসিংদী জেলা সভাপতি শামসুল হক প্রমুখ। প্রধান অতিথি আরো বলেন, শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নের বিধান থাকলেও বাস্তবে শিল্পকারখানাগুলোয় ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম যেভাবে থাকা উচিত সেভাবে নেই। এর প্রথম কারণ হলো আমাদের দেশের রাজনৈতিক বিভক্তি শ্রমিকদের মাঝেও সঞ্চারিত হয়েছে এবং তাদের ঐক্য বিনষ্ট করেছে। দ্বিতীয়ত, মালিক পক্ষ থেকে ইউনিয়নকে ভালো চোখে দেখা হয় না বরং নিরুৎসাহিত করা হয়। তারা মনে করেন, ইউনিয়ন থাকলে উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটবে। তাই আমাদের শ্রমিক অধিকার রক্ষায় মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক তৈরি করে ট্রেড ইউনিয়নের কাজকে এগিয়ে নিতে হবে ও ট্রেড ইউনিয়নকে ফলপ্রসূ করতে শ্রমিকদের অগ্রণী নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে হবে, বিভক্তি কমাতে হবে। দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে নিজেদেরকে জানতে হবে।

ঢাকা অঞ্চল উত্তরের উদ্যাগে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

গত ২১ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা অঞ্চল উত্তরের উদ্যাগে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও অঞ্চল পরিচালক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিমের পরিচালনায় উক্ত প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হুসাইন, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মহিব্বুল্লাহ, গাজীপুর মহানগরী সভাপতি আজহারুল ইসলাম মোল্লা, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান প্রমুখ।

বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করুন

– অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজিঃ নং-বি-২১৩৩) কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, কৃষি ও কৃষকরা দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলেও অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ক্রমাগত অবহেলা এবং ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার কারণে পুরো কৃষি সেক্টরে হতাশা সৃষ্টি করেছে। ফলে কৃষক সমাজ কৃষিকাজে উৎসাহ হারাতে বসেছে। কৃষকের কোন সংগঠন না থাকার কারণে কৃষকরা এক সুরে কথা বলতে পারে না, ফলে কেউ কৃষকের কথা শুনে না। যদি সম্মিলিতভাবে বলা যায়, তাহলে সবাই শুনবে। তাই আগামীতে কৃষি সেক্টরে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য আদায়ে, কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার আদায়ে দায়িত্বশীলদের

ভূমিকা পালন করতে হবে। গত ১২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজিঃ নং-বি-২১৩৩) নির্বাহী কমিটির বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজুর পরিচালনায় এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম, আবুল হাসেম, আব্দুল্লাহ বাছির কৃষিজীবী ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ গাজী আবুল কাশেমসহ নির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ রেজাউল করিম, সাইফুল ইসলাম, এডভোকেট আব্দুর রহমান, মোঃ শামীম আহমেদ প্রমুখ।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, বাংলাদেশের কৃষি এবং কৃষকের অবস্থা এখন নাজেহাল। অপার সম্ভাবনার এই খাতটি অবহেলার সর্বশেষ দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। যারা দিন-রাত ঝড়-বৃষ্টি একাকার করে নিরলস পরিশ্রম করে জমিতে সোনার ফসল ফলায়, তারা প্রতি বছরই কষ্টে অর্জিত ফসলের ন্যায্য দাম পায় না এবং সীমাহীন বৈষম্যের শিকার হয়। সম্প্রতি ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় ধানক্ষেতে আগুন দিয়ে ও রাস্তায় ধান ছিটিয়ে অভিনব প্রতিবাদের ঘটনাও ঘটেছে। অথচ সরকার কৃষকের মূল সমস্যার সমাধান এবং ধান সহ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। বরং ধানের মূল্য নিয়ে কৃষিমন্ত্রীসহ সরকার সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যও অনেকটাই দায়সারা ছিলো। তিনি মনে করেন কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিই আসল সমস্যা। তাই এ কথা সরকার যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন ততই জাতির কল্যাণ। এতে করে কৃষক যেমন ন্যায্যমূল্য পাবেন, তেমনি ভোক্তারা প্রত্যাশিত মূল্যে কৃষিপণ্য কিনতে পারবেন। তাই সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষকদের ন্যায্য দাবি ও চাহিদা পূরণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। মিয়া গোলাম পরওয়ার দায়িত্বশীলদের কাছে আহবান জানিয়ে বলেন, কৃষক সমাজকে বুঝাতে হবে এক মাত্র ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন হলেই শ্রমিক সমাজের দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি সম্ভব এবং আগামীতে কৃষি সেক্টরে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য, কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার আদায়ে দায়িত্বশীলদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। পরে নির্বাহী কমিটির সভায় সকল সদস্যদের সম্মতিক্রমে সরকারের কাছে ৬ দফা দাবি জানানো হয়:

১. কৃষকবান্ধব জাতীয় কৃষিনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. কৃষকদের পণ্য উৎপাদন খরচ কমাতে হবে।

৩. উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা এবং ঝামেলাহীন ভাবে বিক্রির জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

৪. সরকারি উদ্যোগে শাকসবজিসহ পচনশীল কৃষিপণ্যের জন্য হিমাগার নির্মাণ করতে হবে।

৫. কৃষকরা যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান, এ জন্য সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৬. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষকের কৃষি ঋণ মওকুফ করতে হবে।

ঢাকা মহানগরী উত্তরের সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের সদস্য সম্মেলন মহানগরী সভাপতি মুহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা সেলিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা উত্তর অঞ্চল পরিচালক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা কামরুল ইসলাম শাহীন, আবদুল মান্নান পান্না, মোঃ নুরুল আমিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

রংপুর বিভাগের দায়িত্বীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২৩ আগস্ট লালমনিরহাটে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর বিভাগের দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লালমনিরহাট জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আবদুল বাতেন। সমাবেশে ফেডারেশনের রংপুর বিভাগের জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগরী উত্তরের কার্যকরী পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত

গত ৩ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন মহানগরী সভাপতি এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে এবং মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় স্থানীয় একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহান-গরী প্রধান উপদেষ্টা মোঃ সেলিম উদ্দিন। প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী উপদেষ্টা আবদুর রহমান মুসা। অনুষ্ঠানে দারসুল কুরআন পেশ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা উত্তর অঞ্চল পরিচালক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মিজানুর রহমান, গাজী মাহবুবুর রহমান, ইঞ্জিঃ আতাহার আলী, আবদুল আলী বাসার ও অধ্যাপক চৌধুরী নুরুজ্জামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের উদ্যোগে বিভিন্ন পেশা ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের নিয়ে এক ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সভাপতি কাজী আবুল বাশারের সভাপতিত্বে ও বিভাগীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক সামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইলিয়াসের পরিচালনায় উক্ত প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবীর আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, ফেডারেশনের ফরিদপুর জেলা উপদেষ্টা আবু হারিচ মোল্লা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম শাহাজাহান, সাধারণ সম্পাদক মাস্টার জাহাঙ্গীর আলম, মাদারীপুর জেলা সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন, রাজবাড়ী জেলা সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ, গোপালগঞ্জ জেলা সভাপতি শমসের আলী। উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভায় জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে বাছাইকৃত সদস্যদের নিয়ে এক বিশেষ শিক্ষাশিবির গত ১২ জুলাই স্থানীয় এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষাশিবিরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম বুলবুল, উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, আব্দুল মান্নান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

লক্ষীপুর জেলার দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কাজ করে যাচ্ছে

– মিয়া গোলাম পরোয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, শ্রমিকরা আজ নির্যাতিত, অবহেলিত, তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কাজ করে যাচ্ছে। গত ১২ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে উপজেলা দায়িত্বশীলদের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ্ পাটওয়ারীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়ার পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা রুহুল আমিন ভূঁইয়া ও চট্টগ্রাম উত্তর বিভাগের সভাপতি ড. সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা হুমায়ুন কবির প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল দুনিয়ায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত জীবনবিধান আল ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ হিসেবে দেখতে চাইলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে উপজেলা দায়িত্বশীল ভাইয়েরা আদর্শ স্থাপন করবেন।

চট্টগ্রাম মহানগরীর দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শ্রমিক সেবায় এগিয়ে আসুন

-আতিকুর রহমান

সর্বস্তরের শ্রমিকদের সেবায় কাজ করতে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। গত ২২ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর দায়িত্বশীল সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা এনামুল কবির, মকবুল আহমদ, রফিকুল আলম, মোঃ শোয়াইব, এম আদিল, জাহাঙ্গীর আলম, রুহুল আমিন, ইঞ্জিঃ শিয়াবউল্লাহ, কামাল উদ্দিন আহমদ, কাজী রফিকুল হক, মুহাম্মদ নুরুন্নবী, মোঃ কামাল হোসেন, ইউনুছ আলী লিটন ও মুজাহিদুল ইসলাম আদনান প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

কুমিল্লা মহানগরীর দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ১৫ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর দায়িত্বশীল সমাবেশ মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদের সভাপতিত্বে অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার আমিনুল হক। আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির প্রমুখ।

সিলেট মহানগরী কার্যকরী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরী কার্যকরী পরিষদের এক সভা মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসেত চৌধুরী নাহিরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক হাফিজ আবদুর হাই হারুন। সভায় ফেডারেশনের ঘোষিত সাংগঠনিক দশক সার্বিকভাবে সফল করে তোলার জন্য প্রধান অতিথি বিশেষ ভাবে আহবান জানান।

কুমিল্লা মহানগরীর ইউনিট সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুলাই সাংগঠনিক দশক উপলক্ষে ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর বিভিন্ন থানার ইউনিট সভাপতিদের এক সম্মেলন মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদের সভাপতিত্বে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ইউনিট সভাপতিদের সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা কাজী দীন মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাষ্টার আমিনুল হক।

লক্ষীপুর জেলা কার্যকরী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত

শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন-ভিত্তিক কাজের বিকল্প নেই

–আতিকুর রহমান

গত ১৬ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলা কার্যকরী পরিষদের এক সম্মেলন স্থানীয় একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা অধ্যাপক আবদুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবির প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন লক্ষীপুর জেলাসহ সারাদেশে শ্রমজীবী মানুষেরা আজ অধিকার হারা, ঈদে ঘরে ফেরা লোকেরা নাকাল যানজটসহ নানা সমস্যায়।

গরিব ও এতিমের সম্পদ চামড়া আজ মূল্যহীন হয়ে পড়ে থাকে। ডেঙ্গু আক্রান্ত মানুষেরা দিশেহারা। বন্যাকবলিত এলাকাজুড়ে চরম সংকটজনক অবস্থা বিরাজমান, সাধারণ মানুষসহ শ্রমজীবীরা কাজ পাচ্ছে না। ঘরে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথার উপর খোলা আকাশ। এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রয়োজন ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। সেই ক্ষেত্রে জেলা কার্যকরী পরিষদের সদস্য ভাইয়েরা আদর্শ স্থাপন করবেন বলে আমি আশা করি।

নাটোর জেলার শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

গত ২২ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার উদ্যোগে দিন ব্যাপী শিক্ষাশিবির ও ঐতিহাসিক চলনবিলে নৌকাভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নাটোর জেলা সভাপতি অধ্যাপক ড. মো: জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক মো: মফিজ উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রবীন শ্রমিক নেতা অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মীর মো: নুরুল ইসলাম, নাটোর জেলা উপদেষ্টা অধ্যাপক মো: সাদেকুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রাজবাড়ী পৌরসভা ও সদর উপজেলার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজবাড়ী জেলার পৌরসভা ও সদর উপজেলার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি সোলাইমান মুন্সীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সহ-সভাপতি এস এম শাহজাহান। সম্মেলনে আব্দুল আজিজকে সভাপতি এবং জালাল মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পৌরসভা কমিটি এবং আলতাফ হোসেনকে সভাপতি করে ২০ সদস্যবিশিষ্ট সদর উপজেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

পরিবহন সেক্টর কার্যক্রম

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে টার্মিনাল দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিবহন শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে ও জীবন মান উন্নয়নে নেতৃবৃন্দকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে

– অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

পরিবহন শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে ও জীবন মান উন্নয়নে নেতৃবৃন্দকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং আদর্শিক মানসিকতা নিয়ে শ্রকিদের মধ্যে কাজ করতে হবে। "রাজনীতি যার যার, শ্রমিক স্বার্থে একাকার এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দলীয় প্রভাবমুক্ত পরিবহন শ্রমিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। গত ১৯ আগস্ট সোমবার বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত টার্মিনাল দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এই কথা বলেন। পরিবহন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমেদের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ নুরুল হকের পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এইচ এম আতিকুর রহমান। মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, পরিবহন শ্রমিক ও মালিকবান্ধব শ্রমনীতি না থাকায় শ্রমের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না পরিবহন শ্রমিকগণ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো শ্রমবান্ধব শ্রমনীতি বাংলাদেশে নেই। এদেশে লাখ লাখ পরিবহনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। পরিবহন শ্রমিকদের সাথে শ্রমের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয় না। শ্রমিকের বেতন-ভাতা, বোনাস, উৎসব-ভাতা, রাষ্ট্রীয় শ্রমনীতির অনুকরণে শ্রমিকরা পায় না। এক্ষেত্রে মালিক ও প্রশাসন উদাসীনতার মধ্যে আছে। ফলে পরিবহন শ্রমিকসহ দেশের লাখ লাখ শ্রমপেশার সাথে বিভিন্ন সেক্টরে থাকা শ্রমজীবী মানুষ তার ন্যূনতম ন্যায্য অধিকার পাচ্ছে না। অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, আধুনিক বিশ্বের পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্র দর্শনের কোনটাই শ্রমিকের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদার ন্যূনতম সমাধান দিতে পারেনি। ফলে এখনও শ্রমিক-মজুররা নিষ্পেষিত হচ্ছে। মালিকের অসদাচরণ, কম শ্রমমূল্য প্রদান, অনুপযুক্ত কর্মপরিবেশ প্রদানসহ নানা বৈষম্য শ্রমিকের দুর্দশা ও মানবেতর জীবনযাপনের কারণ হয়ে আছে। মালিক-শ্রমিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ইসলাম যে শ্রমনীতি ঘোষণা করেছে, তাকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা গেলে শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা অবশ্যই সুরক্ষিত হবে ইনশাআল্লাহ।

চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের জেলা পরিবহন সম্পাদকদের সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগের সভাপতি মোহাম্মদ ইছহাকের সভাপতিত্বে ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ও পরিবহন সম্পাদকের এক সভা গত ১৮ জুলাই অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং পরিবহন বিভাগের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমেদ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, কক্সবাজার জেলা সভাপতি মাওলানা আলমগীর হোসেন, দক্ষিণ জেলা সভাপতি মনছুর আলি, উত্তর জেলা সভাপতি ইউছুফ বিন আবু বকর ও শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ সৈয়দ নুর। সভায় প্রধান অতিথি সকল জেলা, উপজেলায় ফেডারেশনের তৎপরতা বৃদ্ধি ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সভায় এক প্রস্তাবে প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

রাজশাহী বিভাগ পূর্ব পরিবহন শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৯ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগ পূর্বের পরিবহন শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সভাপতি আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি রাজশাহী পূর্বের অঞ্চল পরিচালক গোলাম রব্বানী। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় পরিবহন বিভাগের সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের বগুড়া জেলা পূর্বের প্রধান উপদেষ্টা আজাদুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের বক্তব্য রাখেন বগুড়া শহর পরিবহন বিভাগের সভাপতি শামসুল ইসলাম কামরুল, সিরাজগঞ্জ জেলা সভাপতি মুহাম্মদ হানিফ, পাবনা জেলা সভাপতি নাসরুল্লাহ, জাহাঙ্গীর, বগুড়া পূর্ব জেলা সভাপতি শফিকুল ইসলাম, বগুড়া পশ্চিম জেলা সভাপতি আব্দুল মান্নান প্রমুখ পরিবহন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা বিভাগ উত্তরের পরিবহন দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ৩০ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ উত্তরের উদ্যোগে পরিবহন বিভাগের জেলা ও মহানগরী দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিভাগ উত্তরের পরিবহন বিভাগের সভাপতি এইচ এম আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় পরিবহন বিভাগের সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, গাজীপুর মহানগরী সভাপতি আজহারুল ইসলাম মোল্লা, শ্রমিক নেতা খান মোঃ ইয়াকুব আলী, রফিকুল ইসলামসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কুমিল্লা মহানগরীর পরিবহন শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঘোষিত সাংগঠনিক দশক উপলক্ষে ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর পরিবহন বিভাগের এক কর্মী সমাবেশ ড্রাইভার মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবহন বিভাগের সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি এবং কুমিল্লা পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উপদেষ্টা কাজী নজির আহমেদ।

সিলেট বিভাগের পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৫ জুলাই বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট বিভাগের জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সম্মেলন ফেডারেশনের সিলেট বিভাগের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা লোকমান আহমদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় সহ-সভাপতি ও হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি মাওলানা মুশাহিদ আলী, বিভাগীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, বিভাগীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট উত্তর জেলা সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, সুনামগঞ্জ জেলা সহ-সভাপতি এডভোকেট রেজাউল করিম তালুকদার, সিলেট উত্তর জেলা সহ-সভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান এডভোকেট জালাল আহমদ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট মহানগর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ শ্রমিকনেতা এ.কে.এম ওলিউল্যাহ, মামুনুর রশীদ, আবু কাওছার কয়েছ, ইসলাম উদ্দিন, নাসির উদ্দীন, মনির মিয়া, ইকবাল আহমদ সজল, জাহেদ মিয়া, ইসহাক আলী, জুলহাস হোসেন বাদল ও মোসাদ্দিক হোসেন প্রমুখ।

শ্রমিকসেবা

বন্যাকবলিত মানুষের মাঝে শ্রমিক কল্যাণের ত্রাণ বিতরণ

গত ২৩ আগস্ট লালমনিরহাটে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, ফেডারেশনের লালমনিরহাট জেলার প্রধান উপদেষ্টা আবদুল বাতেন। রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল এবং ফেডারেশনের লালমনিরহাট জেলা সভাপতি রেনায়েল আলমসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রিকসা শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

সারাদেশে ডেঙ্গুজ্বর ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৬ আগস্ট শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রাজধানীতে দরিদ্র রিকসা শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের মহানগরী উত্তরের সভাপতি মহিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন, শ্রমিক নেতা মনিরুজ্জামান, আবুল কালাম, সোলাইমান, শাহাদাৎ হোসাইন, রুকুনুজ্জামান প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলনে, রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের মানুষ এখন ডেঙ্গু আতঙ্ক নিয়ে জীবন-যাপন করছে। প্রতিদিনই অজস্র মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ইতোমধ্যে সারাদেশে অর্ধশতাধিক মানুষ এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। তিনি মনে করেন সরকারের উদাসীনতার কারণে ডেঙ্গু সমস্যা এখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। অথচ মানুষের এই মৃত্যুর মিছিলে সরকারের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ডেঙ্গু নিয়ে সরকারের মন্ত্রী ও মেয়ররা শুরুর দিকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে মশকরা করেছেন, আবার এখন বলছেন- ডেঙ্গু বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারের দায়িত্বশীল পর্যায়ের এমন ব্যক্তিদের দায়িত্বহীন বক্তব্যে আমরা মর্মাহত। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সরকারের উচিত জনগণের সঙ্গে তামাশা না করে, ডেঙ্গু সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এডিস মশা নিধনে কার্যকর ওষুধ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা এবং ডেঙ্গু সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে -আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও মহানগরীর নির্বাহী সদস্য নজরুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর নির্বাহী সদস্য গাজী আবুল কাশেম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আতিকুর রহমান বলেন, রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে এডিস মশার কামড়ে সৃষ্ট ডেঙ্গুজ্বর ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ডেঙ্গুজ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সতর্ক হতে হবে এবং জনগণকে সচেতন করতে হবে। এডিস মশা ধ্বংস এবং ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তিনি আরো বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। কোন ব্যক্তি বা দলের খুশির জন্য নয় বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা আদায়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য

জনকল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিটি নেতাকর্মীকে যার যার অবস্থানে থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে শ্রমিক জনতাকে সংযুক্ত করতে হবে। এ কাজের গতি আরও তীব্র করতে হবে। আমরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার জন্য, শ্রমিক সমাজকে আহবান জানাচ্ছি।

ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ

গত ৪ আগস্ট ময়মনসিংহ মহানগরী শাখার উদ্যোগে দাপুনিয়ার আনিসুল হকের প্রতিবন্ধী ছেলে আছাদুল্লাহকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়। হুইল চেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের ময়মনসিংহ মহানগরী সভাপতি আনোয়ার হোসেন সুজন এবং সাধারণ সম্পাদক ওয়ালী উল্লাহ মুজাহিদ উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুরের রূপনগর চলন্তিকা বস্তিতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান

বাংলাদেশ রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে মিরপুরের রূপনগর চলন্তিকা বস্তিতে অগ্নিকা- ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় রিকসা শ্রমিকদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। গত ২৬ আগস্ট মঙ্গলবার বাংলাদেশ রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় রিকসা শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করেন। এসময় তিনি বলেন, সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই বাংলাদেশ রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদ সাধ্যমত ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে আসছে। আমাদের এমন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। যার যার অবস্থান থেকে সবাই যদি সাধ্যমত এগিয়ে আসে তাহলে অল্প সময়েই এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। একই সাথে তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সার্বিক সহযোগিতা ও দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কোষাধ্যক্ষ নুরুজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ সরকার, মহানগর উত্তরের সভাপতি মিজানুর রহমান প্রমুখ

চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারে ত্রাণ বিতরণ

গত ২৭ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিনের উদ্যোগে সাতকানিয়া উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন ফেডারশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস.এম. লুৎফর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ সভাপতি মুহাম্মদ ইছহাক, দক্ষিণ জেলা সভাপতি মাস্টার মনসুর আলী, জেলা সহকারী সম্পাদক আব্দুল গফুর, ফেডারেশনের উত্তর সাতকানিয়া উপদেষ্টা এম এ জলিল, সাতকানিয়া সদর সভাপতি মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, উত্তর সাতকানিয়া সভাপতি অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন।

বাংলাদেশ রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদ ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রিকসা শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ

ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাজধানীতে দরিদ্র রিকশা শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদ মহানগর উত্তরের সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুল হকের সভাপতিত্বে ও শ্রমিক নেতা মোঃ আবদুল ওয়াদুদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ রিকসাা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান, বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব লস্কর মোঃ তসলিম, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি জনাব মোঃ মহিব্বুল্লাহ।

নাটোরে ডেঙ্গু প্রতিরোধ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলা শাখার রিক্স-ভ্যান শ্রমিকদের নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সচেতনতা মূলক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নাটোর জেলা সাধারণ সম্পাদক মফিজ উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ড. জিয়াউল হক। আলোচনা সভা শেষে রিকশা-ভ্যান শ্রমিকদের মাঝে ফেডারেশনের নাটোর জেলার পক্ষ থেকে ছাতা বিতরণ করা হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৫ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগর উত্তরের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল কর্মশালা মহানগরী সভাপতি মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন প্রমুখ।

আন্দরকিল্লা দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

গত ২ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত আন্দরকিল্লা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন রেজি নং-১৯৩৭ কর্তৃক আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট '১৯ ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি (বাপুস), চট্টগ্রাম জেলা শাখার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম মজনু, ফেডারেশনের আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড সভাপতি মো: কবির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন সভাপতি জাহিদুল ইসলাম তুহিন, উপস্থাপনায় ছিলেন কামরুল ইসলাম। ফাইনাল খেলায় অংশ গ্রহণ করেন শাহী জামে মসজিদ (নিচতলা) দক্ষিণ একাদশ বনাম শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স উত্তর ২য় তলা একাদশ। অনুষ্ঠানে শেষে বিজয়ীদের ট্রফি বিতরণ করেন প্রধান অতিথি এস এম লুৎফর রহমান।

গুরুদাসপুর উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়ন

গত ১৬ ই আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার অন্তর্ভুক্ত গুরুদাসপুর উপজেলার ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ঐতিহাসিক চলনবিলে এক ঈদ পুনর্মিলনী ও নৌকা ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নাটোর জেলা সাধারণ সম্পাদক মো: মফিজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে

এবং গুরুদাসপুর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মো: শোয়াইব হোসেনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রাজশাহী পশ্চিম বিভাগের সাধারণ সম্পাদক নলডাঙ্গা উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জননেতা অধ্যাপক মাওলানা ড. মো: জিয়াউল হক জিয়া।

কুমিল্লা মহানগরী রংমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুলাই কুমিল্লা মহানগরী রংমিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি: নং-২৮৭৩ এর এক কর্মী সমাবেশ ইউনিয়ন সভাপতি ছিদ্দিকুর রহমান নিজামীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি এবং ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা কাজী নজির আহমদ।

পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন

ঢাকা মহানগরী উত্তর

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার লক্ষে কোরবানির গোশত বিতরণ করা হয়। ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোরবানীর গোশত বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা মো: সেলিম উদ্দিন, অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান, মাওলানা মনিরুজ্জামানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সিলেট মহানগরী

গত ২০ আগষ্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট মহানগরী শাখার উদ্যোগে ঈদুল আজহা উপলক্ষে ঈদ পূনর্মিলনী মহানগরী সভাপতি শাহাজাহান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সিলেট মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক আবদুল বাসেত চৌধুরী নাহিরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ঈদ পূনর্মিলনীতে মহানগরী বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেনন।

লক্ষ্মীপুর জেলা

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে অসহায় গরিব শ্রমজীবী মানুষের মাঝে কোরবানির গোশত বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। রামগঞ্জ উপজেলা সভাপতি ইসমাঈল ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী, রামগঞ্জ উপজেলা উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বগুড়া শহর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর ট্রেড ইউনিয়ন থানা শাখার উদ্যোগে কোরবানির গোশত ও চাল বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রাজশাহী অঞ্চল পূর্বের পরিচালক গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক রাজশাহী বিভাগ পূর্বের সভাপতি আবদুল মতিন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

সিলেট দক্ষিণ জেলা

গত ১৩ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট দক্ষিণ জেলা শাখার উদ্যোগে যুক্তরাজ্য প্রবাসী শ্রমিক নেতা মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও মাহবুবুল হকের অর্থায়নে জেলার শ্রমিক কর্মীদের মাঝে কোরবানির গোশত বিতরণ ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট বিভাগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমদ। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক রেহানউদ্দিন রায়হানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা সহকারী সাধারণ সম্পাদক জাহেদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল হান্নান, প্রচার সম্পাদক রুকুনুজ্জামান চৌধুরী, আইন আদালত সম্পাদক আবদুল কাদির, সাহায্য ও পুনর্বাসন সম্পাদক এজাজুর রহমান, সহ-প্রচার সম্পাদক নুরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক জমির হোসাইন, তানভীরে এলাহী মজুমদার, নাজমুল ইসলাম বুলবুল, আতাউর রহমান আলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নোয়াখালী জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী সদর উপজেলার উদ্যোগে অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে কোরবানির গোশত বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের নোয়াখালী সদর উপজেলা সভাপতি ডা: মিরাজুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর জেলা

গত ১৬ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর জেলার উদ্যোগে উপজেলা সভাপতিদের নিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ডা: মুজাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক ফারুকুজ্জামানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মো: মনসুর রহমান।

চট্টগ্রাম জেলা উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার উদ্যোগে গত ১৩ আগস্ট অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে কোরবানির গোশত বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের সীতাকুন্ড উপজেলা সভাপতি এডভোকেট আশরাফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বকর, উপদেষ্টা মো: শহীদুল্লাহ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

বিবৃতি

বাজেটে শ্রমজীবী মানুষকে উপেক্ষা করা হয়েছে: অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট শ্রমিক জনগোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্য বৃদ্ধির একটি দলিল। গত ১৪ জুন এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন। গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, অনির্বাচিত ফ্যাসিবাদী সরকারের অর্থমন্ত্রী গত ১৩ জুন জাতীয় সংসদে ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার মোটা অঙ্কের যে অবাস্তব বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন তা সরকারের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না বলেই দেশের অর্থনীতিবিদরা মনে করেন। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটের গোটা অর্থের এক-তৃতীয়াংশই ঋণনির্ভর। বাজেটে সম্পদশালীদের সুবিধা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে বাজেটে ধনীর জন্য নানা সুবিধা দেয়া হয়েছে কিন্তু গরিব, প্রান্তিক শ্রমিক জনগোষ্ঠী ও মধ্যবিত্তদের সুবিধা দেয়া হয়নি, তারা বঞ্চিতই রয়ে গেল। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তাই এই বাজেট শ্রমিক জনগোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য বাড়াবে। তিনি আরো বলেন, যে

সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, সে সমাজ আজ হোক-কাল হোক টেকে না, এগোতে পারে না। যেভাবে বাংলাদেশে বৈষম্য বাড়ছে তাতে ৭, ৮ ও ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি টেকানো কষ্টকর হবে। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, বাজেটে রাজস্ব আয়ের দুঃসহ ভারের সবটাই বহন করতে হবে গরিব ও মধ্যবিত্তসহ সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর এবং চার স্তরের ভ্যাটের বোঝা আরো বাড়বে। ধনীদের সারচার্জে বড় ধরনের ছাড় দিয়ে তাদের তুষ্ট করা হয়েছে। ধনীদের সম্পদ কর বা সারচার্জের সীমা দুই কোটি ২৫ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন কোটি টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এবারের বাজেটে আয়করমুক্ত আয়ের সীমা বিগত তিন বছরের মতোই দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। অথচ বাস্তবতার নিরিখে তা হওয়া উচিত ছিল কমপক্ষে পাঁচ লাখ টাকা। তিনি আরো বলেন, ব্যর্থ সরকারের উচ্চাভিলাষী ও অবাস্তব কৌশলী বাজেট দেশের গরিব শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে আরো হতাশ করবে। বাজেটে মুদ্রাস্ফীতি ধরা হয়েছে ৫.৬ শতাংশ। বিরাট অংকের বাজেট পেশ করার ফলে মুদ্রাস্ফীতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত গরিব শ্রমিক জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ আরো বেড়ে চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কা করা হচ্ছে। গোলাম পরওয়ার বলেন, বর্তমান সরকার জনগণের নির্বাচিত সরকার নয়। দেশের জনগণের প্রতি এ সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তাই প্রস্তাবিত বাজেটে দেশের বৃহৎ শ্রমিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ উপেক্ষা করে সরকারের দলীয় লোকদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধনীকে আরো ধনী এবং গরিবকে আরো গরিব করা, ধন বৈষম্য ও শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি করা, সামাজিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি করা ইত্যাদি হবে এই বাজেটের ফলাফল। এই বাজেট জাতির অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নৈরাজ্য, অস্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলবে। তাই শ্রমিক সমাজ প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৯-২০২০ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশবাসীকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশবাসীসহ সর্বস্তরের সকল শ্রমিক কর্মচারী ভাই-বোনদেরকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং ঈদের আনন্দ শ্রমিকদের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি– এই প্রত্যাশা করেছেন। গত ১১ আগস্ট শনিবার ফেডারেশনের নেতৃদ্বয় এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, কোরবানির মহান আদর্শ নিয়ে পবিত্র ঈদুল আজহা আমাদের দ্বারে সমাগত। মুসলমানদের নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা– এ দু'টি ঈদই আনন্দের দিন। এ দু'ঈদে মানুষ সকল ভেদাভেদ, হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হয় এবং ঈদগাহে গিয়ে নামাজ আদায় করে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা আমাদেরকে শুধু আনন্দই দেয় না, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও অনৈক্য ভুলে গিয়ে পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। ঈদ আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয়ভাবে ঐক্যের বন্ধন শক্তিশালী করে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ঈদুল আজহা মানুষকে ত্যাগ ও কোরবানির আদর্শে উজ্জীবিত করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ দূর করে একটি শোষণমুক্ত ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রেরণা দেয়। আমরা যদি ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলেই বাস্তব জীবনে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করে সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করতে পারি তাহলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হবে। তারা বলেন, জাতি এমন এক সময় পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করতে যাচ্ছে যখন, দেশের বর্তমান অবস্থায় সকলের পক্ষে ঈদের আনন্দ যথাযথভাবে উপভোগ করা সম্ভব হবে না। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি, দরিদ্র ও কম আয়ের মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ডেঙ্গুর ভয়াবহতা জনজীবনে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অন্য দিকে দেশের ভয়াবহ বন্যায় দেশের মানুষের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। নেতৃদ্বয় দেশের সকল বিত্তবান ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানান-দরিদ্র ও অসহায় মানুষের দিকে সাহায্য ও সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করার জন্য। সর্বোপরি তারা কোরবানির পশুর বর্জ্য, রক্ত, জমে এডিস মশা যাতে বংশ বিস্তার না করতে পারে সেই দিকে খেয়াল রেখে সাধ্যমত নিজেদের উদ্যোগে যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করে অন্যকেও সচেতন করতে দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। পরিশেষে ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশবাসী শ্রমিকসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং আমরা মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি তিনি আমাদের সবাইকে সুন্দর পরিবেশে ঈদুল আজহা উদযাপন করার ও ঈদুল আজহার শিক্ষা বাস্তব জীবনে ধারণ করার তাওফিক দান করুন।

বিকল্প ব্যবস্থা না করে রিকসা উচ্ছেদ নিষ্ঠুরতা ও মানবতার পরিপন্থী

-বাংলাদেশ রিক্সা শ্রমিক ঐক্য পরিষদ

বিকল্প ব্যবস্থা না করে রিকসা উচ্ছেদ নিষ্ঠুরতা, মানবতার পরিপন্থী। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে এ উচ্ছেদ গরিবের পেটে লাথি মারার শামিল। গত ১০ জুলাই রাজধানীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে রিকসা চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে বাংলাদেশ রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং সাধারণ সম্পাদক লস্কর মোঃ তসলিম এক যৌথ বিবৃতিতে এক কথা বলেন। তারা আরো বলেন, দেশ আজ দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে লুটেরা শক্তি, অন্যদিকে মেহনতি মানুষ। সরকার লুটেরা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করছে বলেই মেহনতি মানুষের পেটে লাথি পড়ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে রিকসা ভ্যান শ্রমিকদের অবদানের বিষয়টি অনস্বীকার্য, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রেখে যাচ্ছে রিকসা ভ্যান শ্রমিকরা, তাই রিকসা ভ্যান শ্রমিকদের মর্যাদা দিতে হবে। অনেকেই রিকসাকে জানজটের কারণ দেখাতে চায়, পরিবেশবান্ধব ঐতিহ্যবাহী এই বাহনকে নিষিদ্ধ করতে চায়। স্বাভাবিক চলাচলে বাধার সৃষ্টি করতে চায়, আমরা এক্ষেত্রে সকলের দূরদর্শী গঠনমূলক দায়িত্বশীল ভূমিকা কামনা করি। তারা আরো বলেন, বাংলাদেশে রিকসা শ্রমিকরা অবহেলিত, অধিকারবঞ্চিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, রিকসা ভ্যান শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে সরকারের ভূমিকা রাখা উচিত ,যাতে বৈষম্য দূরীভূত হয়। তাই এ লক্ষ্যে পৌছাতে আমরা শ্রমিক-জনতার ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতা কামনা করি। বিবৃতিতে বাংলাদেশ রিকসা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ জানানো হয়। রিকশা পরিবেশবান্ধব বাহন কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে তা নিষিদ্ধ করা যাবে না। রিকশা চালককে একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। রিকশাকে পরিবেশবান্ধব বাহন হিসাবে মর্যাদা দিয়ে রিকশা শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে

হবে। নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়ক পরিকল্পনায় অবশ্যই আলাদা রিকশা লেন রাখতে হবে।

নিজেদের অপকর্মের বোঝা জনগণের ওপর চাপাতে সরকার দফায় দফায় গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করছে

– অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

গত ২ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এক বিবৃতিতে বলেন, গ্রাহকপর্যায়ে গ্যাসের দাম গড়ে ৩২.৮ শতাংশ বাড়ানোর ফলে সার, বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদনের ব্যয় বাড়বে যার ভার শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের ঘাড়েই চাপবে। গ্যাসের দাম বাড়িয়ে সরকার জনগণের অর্থনৈতিক দুর্ভোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। মূলত নিজেদের অপকর্মের বোঝা জনগণের ওপর চাপাতে সরকার দফায় দফায় গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করছে। তিনি আরো বলনে, এ সিদ্ধান্ত দরিদ্র ও সাধারণ শ্রমিকের জন্য মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। সরকারের এ অন্যায় সিদ্ধান্তে দেশের গোটা অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। যা অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক এবং গণবিরোধী। সরকার মূলত দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তারা জনজীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে ক্রমেই গণদুর্ভোগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। একের পর এক সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তিনি বলনে, ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির কোনো কারণ সৃষ্টি হয়নি, অথচ সরকার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে বিশাল ভোগান্তিতে নিক্ষেপ করলো। সরকার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে তা নতুন করে গণদুর্ভোগের সৃষ্টি করবে এবং দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটবে। যা প্রান্তিক শ্রমিক জনগোষ্ঠীর জন্য অসহনীয় পর্যায়ে পৌছবে। তাই তিনি অবিলম্বে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির গণবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

শোকবাণী

শ্রমিকনেতা এস এম শাহজাহানের পিতার মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সহ-সভাপতি এস এম শাহজাহানের শ্রদ্ধেয় পিতা ফরিদপুরের প্রবীণ শিক্ষাবিদ এ বি এস আহমেদ আলী রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান এবং ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি কাজী আবুল বাশার ও সাধারণ সম্পাদক মাস্টার জাহাঙ্গীর আলম এক যৌথ শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। উল্লেখ্য, এ বি এস আহমেদ আলী ৭৮ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। জনাব এ বি এস আহমেদ আলীর প্রথম জানাজা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। পরে ফরিদপুরে দ্বিতীয় জানাযা শেষে ঢাকায় বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে, ৩ মেয়ে, নাতি-নাতনী ও আত্মীয়-স্বজন অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন।

শ্রমিক নেতা মাহির উদ্দিনের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ টিঅ্যান্ডটি শ্রমিক কর্মচারী আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়নের (BTCL) কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহির উদ্দিন ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান যৌথ শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে নেতৃবৃন্দ বলেন, মাহির উদ্দিনের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শুধু একজন অভিজ্ঞ শ্রমিক নেতাই হারালো না বরং শ্রমিক অঙ্গন হারালো একজন দক্ষ ও বর্ষীয়ান শ্রমিকনেতা। শোকবাণীতে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আলাহ তায়ালা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। এ ছাড়া মরহুম মাহির উদ্দিনের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম বুলবুলসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, মহির উদ্দিন ৬৩ বছর বয়সে ৪ সেপ্টেম্বর রাত নয় ঘটিকায় ঢাকায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মরহুম মহির উদ্দিনের প্রথম জানাযার নামাজ ঢাকায় বাড্ডায় সাতারকুলে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন চঞ্চল, নজরুল ইসলাম সহ থানা, ট্রেড ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পরে মরহুমের নিজ বাড়ি মানিকগঞ্জের শিবালয় দ্বিতীয় জানাজা শেষে তার নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরে তাকে শায়িত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ৩ মেয়ে, নাতি-নাতনী ও আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন।

চট্টগ্রামের কর্নফুলী উপজেলার ফেডারেশনের সভাপতি ডা: মাওলানা ওমর ফারুক আজম এর মৃত্যুতে জেলা নেতৃবৃন্দের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার কার্যকরী কমিটির সদস্য ও কর্ণফুলী উপজেলার সভাপতি মজলুম জননেতা ডা: মাওলানা ওমর ফারুক আজম এর মৃত্যেতে ফেডারেশনের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে মাষ্টার মনসুর আলী ও আরিফুর রশিদ শোক প্রকাশ করেছেন এবং তার পরিবার ও পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চল দক্ষিণ আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন লিডারশীপ ট্রেনিং প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

মিরপুরের রূপনগর চলন্তিকা বস্তির অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তর আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

কুমিল্লা জেলা দক্ষিণ আয়োজিত ইউনিয়ন সভাপতিদের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

লালমনিরহাট জেলার বন্যাদুর্গত শ্রমিকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে থানা সভাপতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকা মহানগরী উত্তর আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া

লক্ষ্মীপুর জেলার উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে কোরবানীর গোশত বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার
৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়েদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৯৯২৯৫১৩৬৪